কিশোর ক্লাসিক

রবার্ট লুই স্টিভেনসন-এর

কিডন্যাপড

রূপান্তরঃ নিয়াজ মোরশেদ

সবা প্রকাশনী

শ্যামল

কিশোর ক্লাসিক

কিডন্যাপড

রবার্ট লুই স্টিভেনসন

Visit www.banglapdf.net For
More Exclusive, High Quality,
Water-mark less
E-books.

Please Give Us Some Credit
When You Share Our Books.

And Don't Remove This
Page. Thank You.

-SHAMOL

সেবা প্রকাশনীর

আরও ক'টি কিশোর ক্লাসিক

দুর্গেশ নন্দিনী/বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
রূপান্তর : নিয়াজ মোরশেদ

বেনহুর/লিউ ওয়ালেস
রূপান্তর : মুনতাসীর মামুন

রবিনসন ক্রুসো/ড্যানিয়েল ডিফো
রূপান্তর : নিয়াজ মোরশেদ

কালোতীর/রবার্ট লুই স্টিভেনসন
রূপান্তর : নিয়াজ মোরশেদ

সলোমনের গুপ্তধন/হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড
রূপান্তর : রকিব হাসান

দুঃসাহসী টম সয়ার/মার্ক টোয়েন
রূপান্তর : রকিব হাসান

সী উল্ফ/জ্যাক লণ্ডন
রূপান্তর : নিয়াজ মোরশেদ

তিন মাস্কেটিয়ার/ আলেকজান্দার দ্যুমা
রূপান্তর : নিয়াজ মোরশেদ

প্রবাল দ্বীপ/রবার্ট মাইকেল ব্যালান্টাইন
রূপান্তর : রকিব হাসান

কপালকুণ্ডলা/বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
রূপান্তর : নিয়াজ মোরশেদ

[illegible]/রেনে জুইঅ
রূপান্তর : রকিব হাসান

কিশোর ক্লাসিকের ত্রয়োদশ বই

কিডন্যাপড

রবার্ট লুই স্টিভেনসন

রূপান্তর :

নিয়াজ মোরশেদ

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২

অনুবাদক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ১৯৮৬

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শরাফত খান

মুদ্রণে :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
দূরালাপন : ৪০৫৩৩২
জি. পি. ও বক্স নং ৮৫০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০, বাংলাবাজার
ঢাকা-১

Kidnapped
By Robret Louis Stevenson
Trans. Neaz Morshed

কিডন্যাপড

রবার্ট লুই স্টিভেনসন

রূপান্তর :

নিয়াজ মোরশেদ

রবার্ট লুই স্টিভেনসন

জন্ম ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে। জীবনের শুরুতেই আক্রান্ত হন যক্ষ্মায়। বড় হওয়ার সাথে সাথে সমুদ্রের প্রতি অদম্য এক ভালোবাসা জন্ম নেয় তাঁর মনে। ক্ষয় রোগাক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কয়েকটি দুঃসাহসী সমুদ্রযাত্রায় অংশ নেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই 'অর্ডার্ড সাউথ'। একগুচ্ছ প্রবন্ধের সংকলন হলেও বইটি আত্মজীবনীমূলক। কি অসহনীয়ভাবে তাঁকে জীবন কাটাতে হয়েছে তা-ই জীবন্ত হয়ে উঠেছে রচনাগুলোয়। শারীরিকভাবে প্রায় অক্ষম একটি লোকের দুরন্ত অভিযাত্রী আত্মার করুণ আর্তনাদ যেন।

যদিও 'অর্ডার্ড সাউথ' পড়ে সমালোচকরা ভেবেছিলেন, প্রবন্ধকার হিসেবে হয়তো একদিন নাম করবেন স্টিভেনসন, কিন্তু বাস্তবে 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড' লিখেই তিনি স্বীকৃতি পেলেন বড় লেখক হিসেবে। 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড'-এর সাফল্যের পর লিখলেন, কিডন্যাপড', 'ক্যাতরিওনা', 'দ্য ব্ল্যাক অ্যারো', 'দ্য মাস্টার অফ ব্যালানট্রে', এবং আরো অনেক। 'ওয়্যার অফ হার্মিস্টন'কে তাঁর সেরা সৃষ্টি হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন সমালোচকরা।

তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে লেখা বইগুলোর মধ্যে রয়েছে, 'অ্যান ইনল্যাণ্ড ভয়েজ', 'ট্রাভেল্‌স উইদ এ ডাংকি'। এ ছাড়াও 'দ্য অ্যামেচার ইমিগ্র্যাণ্ট', 'দ্য সিলভারেডো স্কয়্যাটারস', এবং 'ইন দ্য সাউথ সিজ', বইগুলোয় তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছোঁয়া পাওয়া যায়।

১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে এই অমর কথা-সাহিত্যিক মারা যান।

এক

জুন, ১৭৫১।

চিরতরে বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছি আমি।

একটু আগে ভোর হয়েছে। পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় সূর্য সোনা ঝরাচ্ছে। লিল্যাক বাগানে শিস দিচ্ছে কোকিল। পুরো উপত্যকা এখনো মুড়ি দিয়ে আছে কুয়াশার চাদর। আর আমি এখন পথে। জন্মের পর থেকে যে বাড়িতে বেড়ে উঠেছি, চলে যাচ্ছি সে বাড়ি ছেড়ে।

দু'মাস আগে মা মারা গেছে। কিছুদিন পরে বাবা-ও। আমি এখন একা এই পৃথিবীতে। গ্রামে আমার করার মতো কোনো কাজ নেই। তাই ভাগ্যের সন্ধানে বেড়িয়ে পড়েছি পৃথিবীর পথে।

মিস্টার ক্যাম্পবেল তার বাগানের দরজায় অপেক্ষা করছিলেন আমার জন্যে। ভদ্রলোক এসেনডিনে রাজার প্রতিনিধি। খুব ভালো মানুষ।

'সকালে খাওয়া হয়েছে, ডেভিড?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'হ্যাঁ, স্যার।'

'বেশ, তাহলে চলো,' বলতে বলতে আমার হাত ধরলেন মিস্টার ক্যাম্পবেল, 'তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি কিছুদূর।'

নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলাম আমরা।

'এসেনডিন ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে?' কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'কেন স্যার? এসেনডিন চমৎকার জায়গা সন্দেহ নেই। ভালোই ছিলাম এখানে। তবে দুনিয়ার আর সব জায়গার তুলনায় কেমন কে জানে? বাবা মা দুজনই মারা গেছে, এখন আমার কাছে এসেনডিন-ও যা হাঙ্গেরিও তা। এই অজ পাড়াগাঁয়ে আর পড়ে থাকতে চাই না, বেরিয়ে পড়ি, দেখি আমার কপালে কি আছে।'

'বেশ বেশ, ডেভি,' বললেন মিস্টার ক্যাম্পবেল। 'তাহলে এটাই বোধহয় উপযুক্ত সময় জিনিসটা তোমাকে দেয়ার।'

'কি জিনিস?'

'তোমার বাবার চিঠি। ও যখন মৃত্যু শয্যায় তখন দিয়ে গিয়েছিলো আমাকে। বলেছিলো, তার মৃত্যুর পর যেন দেই তোমাকে।'

বলতে বলতে পকেট থেকে একটা মুখ বন্ধ খাম বের করে এগিয়ে দিলেন আমার দিকে।

খামটা নিলাম আমি। উপরে ঠিকানা লেখা:

এবেনের ব্যালফোর,
শ'বাড়ি,
ক্র্যামণ্ড।

ঠিকানার নিচেই আমার বাবার হাতে লেখা: আমার পুত্র ডেভিড ব্যালফোর পৌঁছে দেবে এই চিঠি।

ভীষণ অবাক হলাম। বাবা কখনো তার পরিবার বা বংশ সম্পর্কে

কিছু বলেনি আমাকে। মা-ও না। কে এই এবেনের ব্যালফোর? শ বাড়িটাই বা কি?

আমার অবাক ভঙ্গি দেখে ব্যাখ্যা করলেন মিস্টার ক্যাম্পবেল, 'চিঠিটা দেয়ার সময় তোমার বাবা আমাকে বলেছিলেন, "শ বাড়িতে পাঠিয়ে দিও ছেলেটাকে। আমার পরে ও-ই ও বাড়ির আইনসম্মত মালিক। আমি ওখান থেকে চলে এসেছিলাম, আমার ছেলেকে যেতেই হবে ওখানে।" '

'আমি শ বাড়ির আইনসম্মত মালিক!' বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলাম। 'বাবা কি শ বংশের ছেলে?'

'আমি জানি না, ডেভিড. তোমার বাবা কোন্ বংশের ছেলে। ও কখনো বলেনি আমাকে। তবে এটুকু জানি, তোমার বাবা সত্যিই একজন ভদ্রলোক ছিলেন, খাঁটি ভদ্রলোক, লেখা পড়া-ও করেছিলেন বিস্তর। শ পরিবার দেশের খুব পুরনো আর সম্মানিত বংশগুলোর একটা। এক কালে প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক ছিলো ওরা। ওখানে যদি যাও, আশা করি তোমার আর কোনো সমস্যা থাকবে না।'

আমার বয়স এখন সতেরো বছর। এই বয়সে আচমকা সামনে এমন এক সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যেতে দেখে হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে গেল আমার।

'মিস্টার ক্যাম্পবেল,' প্রায় তোতলাতে তোতলাতে বললাম, 'আমার জায়গায়—আমার জায়গায় যদি আ—আপনি হতেন, তা—তাহলে কি যেতেন?'

'নিশ্চয়ই। নির্দ্বিধায়। তোমার মতো শক্ত সমর্থ ছেলে, দু'দিন হেঁটেই পৌঁছে যেতে পারবে ক্র্যামণ্ড-এ। জানো তো জায়গাটা এডিন-বরার কাছে? তারপর যদি দেখওরা তোমাকে সাদরে গ্রহণ করছে না,

অন্য কোথাও না যেতে পারলে চলে এসো এখানে। দু'দিনেরই তো হাঁটা পথ, যেতে পারলে ফিরতে-ও পারবে। একটা কথা মনে রেখো আমার দরজা সব সময় খোলা থাকবে তোমার জন্যে। আমি তোমার সত্যিকারের বন্ধু। অবশ্য আমার ধারণা, এত কিছুর দরকার করবে না, ওরা তোমাকে সাহায্য করবে।'

একটু থামলেন মিস্টার ক্যাম্পবেল। তারপর খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলছেন এমন ভঙ্গিতে বলে চললেন, 'এসো, এখানে একটু বসি আমরা।' পথের পাশে নিচু একটা দেয়ালের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। 'যাওয়ার আগে কিছু পরামর্শ দিই তোমাকে।'

বসলাম আমরা। সূর্য অনেকখানি উঠে এসেছে ইতিমধ্যে। বেশ গরম লাগছে। বৃদ্ধ মিস্টার ক্যাম্পবেল পকেট থেকে রুমাল বের করে মাথা ঢাকলেন।

'ডেভিড,' শুরু করলেন তিনি, 'যা-ই করো না কেন, প্রার্থনা করতে ভুলো না কখনো। প্রত্যেকদিন বাইবেল থেকে কিছুটা করে পড়বে। তোমার মতো কম বয়েসী, বিশেষ করে মা-বাবা হারা ছেলেদের জন্যে ভয়ঙ্কর জায়গা এই দুনিয়া। যে দিকেই যেতে চাও না কেন বিপদ এড়ানোর উপায় প্রায় নেই। সুতরাং সাবধানে থাকবে। আর, কোনো বিপদ ঝামেলায় জড়ালে ঈশ্বরকে স্মরণ করবে। ঈশ্বরে আস্থা রাখবে, দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।' একটু হাসলেন মিস্টার ক্যাম্পবেল, আমার দিকে তাকিয়ে। 'নতুন জায়গায় নতুন মানুষের ভেতর যাচ্ছো তুমি, ডেভিড, ওরা কেমন লোক কিছু জানা নেই, আমার ধারণা ভালো-ই হবে। যাহোক, ওরা যেমনই হোক তোমাকে কিন্তু ভালো হতেই হবে। সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে। কিছুতেই ভুললে চলবে না, গরীব হলেও ভদ্র পরিবারের ছেলে তুমি। আমা-

দের এসেনডিনের মান সম্মান-ও নির্ভর করবে তোমার আচরণের ওপর। বাড়ির কর্তাকে বিশেষ সম্মান দেখাবে। তোমার চেয়ে যারা বয়সে বড় সবাইকে মেনে চলবে। কথা দাও, ডেভিড আমার কথা রাখবে।'

'চেষ্টা করবো, স্যার।'

'বেশ বেশ, চেষ্টা করলেই হবে।' পকেটে হাত ঢুকিয়ে অনেক কষ্টে ছোট একটা পুলিন্দা বের করলেন মিস্টার ক্যাম্পবেল। আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা রাখো তোমার কাছে। চারটে জিনিস আছে এতে। এক নম্বর হলো কিছু টাকা —তোমার বাবার সব বই আমি কিনে নিয়েছি, তার দাম। বাকি তিনটে আমার আর আমার স্ত্রীর পক্ষ থেকে তোমাকে উপহার।'

উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার ক্যাম্পবেল। চোখের কোনায় চিকচিক করছে জল। কোনোরকমে বললেন, 'আসি তাহলে, ডেভিড, ভালো থেকো।' তারপর আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। চলে গেলেন যেদিক থেকে এসেছিলেন সেদিকে।

মিস্টার ক্যাম্পবেল চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরেও বসে রইলাম স্থানুর মতো। আমার-ও ঝাপসা হয়ে এসেছে দৃষ্টি। চেনা জায়গা, চেনা মানুষগুলো ছেড়ে যাচ্ছি। যে বাড়িতে আশৈশব মানুষ হয়েছি সেখানে হয়তো আর কোনোদিনই ফিরে আসবো না! তবু শ বাড়ির জাঁকজমক, দাস-দাসী আর দামী আসবাব-পত্রের কল্পনা যখন মনে এলো খুশি হয়ে উঠলাম আমি। পুলিন্দাটা তাড়াতাড়ি খুললাম। মিস্টার এবং মিসেস ক্যাম্পবেলের উপহারগুলো কেমন, দেখি।

প্রথমেই বেরোলো ছোট একটা বাইবেল। তারপর একটা শিলিং। তারপর একটুকরো মোটা হলুদ কাগজ। লাল কালিতে লেখা তার

ওপর, সর্বরোগহর অদ্ভুত এক ওষুধের প্রস্তুত প্রণালী। সব শেষে ছোট্ট একটা খলের বাবার বইগুলোর দাম।

কাঁধে একটা লাঠির মাথায় বাঁধা পুঁটুলিতে রয়েছে আমার যাবতীয় সম্পদ। মিস্টার ক্যাম্পবেলের পুলিন্দাটাও রেখে দিলাম সেটার ভেতর। তারপর উঠতে শুরু করলাম পাহাড়ের ঢাল বেয়ে।

চূড়ায় পৌঁছে পেছন দিকে তাকালাম একবার। শেষ বারের মতো দেখে নিলাম সবুজ উপত্যকার ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া পায়ে চলা পথটা। দূরে দেখতে পেলাম এসেনডিনের গির্জা। গাছ-পালায় ঘেরা রাজ প্রতিনিধির বাড়ি, গির্জার উঠান, তারপরেই কবর-স্থান। ওখানে শুয়ে আছে আমার মা, বাবা।

আবার ভিজে উঠতে চাইলো দু'চোখ। আপনমনেই একবার মাথা নেড়ে তাড়িয়ে দিলাম দুর্বলতাটুকু। পুঁটুলি বাঁধা লাঠিটা কাঁধে ফেলে হাঁটতে শুরু করলাম ক্র্যামণ্ড-এর পথে, শ বাড়ির পথে। নিশ্চিত জানি ওখানে দারুন এক ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে আমার জন্যে।

দুই

পরদিন দুপুরের একটু আগে এক পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছুলাম আমি। সামনে বিছিয়ে আছে বিস্তীর্ণ উপত্যকা। ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে নেমে গেছে সাগর পর্যন্ত। মাঝখানে ঝকমকে এডিনবরা নগরী। প্রাসাদ-দুর্গের চূড়ায় পতাকাটা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পেলাম। উড়ছে পত পত করে। খাঁড়িতে নোঙর করে আছে অনেক জাহাজ। পাল তুলে চলে যাচ্ছে কোনো কোনোটা। শহরের রাস্তায় অসংখ্য মানুষ, ঘোড়ার গাড়ি। এক পলক দেখেই আমার হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে উঠে আসতে চাইলো। কম্পিত বুকে নামতে শুরু করলাম পাহাড় বেয়ে।

কিছুদূর আসার পর একটা কুটির দেখতে পেলাম। এক রাখাল থাকে সেখানে। কোন্ পথে গেলে ক্র্যামণ্ডে পৌঁছুনো যাবে তার একটা মোটামুটি বর্ণনা পেয়ে গেলাম তার কাছে। তারপর আবার পথে নামলাম।

পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলেছি। একটু পরপরই পথচারীদের কাছে জেনে নিচ্ছি, ঠিক পথে যাচ্ছি কিনা। অবশেষে গ্লাসগো সড়কে উঠলাম। সেখান থেকে সামান্য এগিয়ে আরেকজনকে জিজ্ঞেস করতেই ভদ্রলোক বললেন, ক্র্যামণ্ডের যাজক পল্লীতে পৌঁছে গেছি। এবার

আর ক্র্যামণ্ড নয়, শ বাড়ি কোন্ দিকে, জিজ্ঞেস করতে লাগলাম পথচারীদের।

প্রথম জনকে জিজ্ঞেস করতেই অবাক চোখে চাইলো আমার দিকে। ভুরু কুঁচকে, যেন মহা কোনো অপরাধ করে ফেলেছি এমন ভঙ্গিতে বললো, 'সোজা চলে যাও।' তারপর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে নিজের পথে চলে গেল লোকটা।

একটু পরে আরেকজনকে একই প্রশ্ন করলাম। সে-ও একই ভঙ্গিতে তাকালো আমার দিকে, একই ভঙ্গিতে জবাব দিলো এবং চলে গেল।

পরেরজনও তাই করলো। আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ব্যাপার কি? আমার চেহারা, কমদামী জামা কাপড় দেখে পছন্দ হয়নি ওদের? ভেবেছে অমন বিশাল জাঁকালো বাড়িতে ঢোকার উপযুক্ত নই আমি?

একটু পরে দেখলাম ঘোড়ায় টানা গাড়িতে করে এদিকে আসছে এক লোক। চেহারা দেখেই কেন জানি মনে হলো লোকটা ভালো, সাদাসিধে। ঠিক করলাম ওকে জিজ্ঞেস করবো। এবার প্রশ্নের ধরন বদলালাম। জিজ্ঞেস করলাম, শ বাড়ি বলে কোনো বাড়ির কথা শুনেছে নাকি কখনও।

গাড়ি থামিয়ে আমার মুখের দিকে তাকালো লোকটা, আগের ওদের মতোই অদ্ভুত দৃষ্টিতে।

'হ্যাঁ,' বললো সে। 'কেন?'

'খুব বড় বাড়ি নিশ্চয়ই?' আমার প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, বড়,···বিরাট বড়।'

'আর ওখানে যারা থাকে?'

'ওখানে যারা থাকে! পাগল নাকি? ওখানে আবার কে থাকবে?

…কেউ না।'

'কি বলছেন আপনি? মিস্টার এবেনের থাকেন না?'

'ও, হ্যাঁ, ওকে যদি মানুষ বলো তাহলে থাকে। তা ওখানে কি দরকার তোমার?'

'একটা চাকরি পাবো আশা করছি,' যথাসম্ভব নম্র গলায় বললাম আমি।

'কি?' এমন তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করলো গাড়িওয়ালা যে ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠলো তার ঘোড়াটা। 'দেখো, বাছা,' বলে চললো সে, 'তোমার ব্যাপার, আমার নাক গলানো উচিত না, তবু তোমাকে আমার ভালো ছেলে বলেই মনে হলো তাই বলছি, কাছেও ঘেঁষো না ও বাড়ির।'

সাঁৎ করে ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষালো লোকটা। চলতে শুরু করলো গাড়ি।'

হতভম্বের মতো রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। 'কাছেও ঘেঁষো না ও বাড়ির!' কেন? কি রহস্য লুকিয়ে আছে শ বাড়িতে? কিছুই মাথায় আসছে না আমার। বুঝতে পারছি না কি করবো।

নিরুপায় হয়ে হাঁটতে লাগলাম আবার। কিছুক্ষণ পরে সুন্দর শাদা পরচুলা পরা এক লোকের সাথে দেখা হলো। হাতে যন্ত্রপাতির বাক্স দেখে বুঝলাম লোকটা নাপিত। কাজের খোঁজে বেরিয়েছে। সাধারণত নাপিতেরা এলাকার প্রায় সবাইকে চেনে, জানে। এ হয়তো বলতে পারবে মিস্টার এবেনের সম্পর্কে।

'শ বাড়ির মিস্টার ব্যালফোর কেমন লোক বলতে পারেন?' সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

'ধুর ধুর,' বললো নাপিত, 'ও কোনো মানুষের জাতও না। কেন,

কি দরকার তাকে ?'

'এই এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম আর কি,' প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলাম আমি।

আর দাঁড়ালো না নাপিত, চলে গেল নিজের কাজে।

মন খারাপ হয়ে গেল আমার। অনেক আশা নিয়ে এসেছিলাম, শ বাড়িতে আশ্রয় পাবো। কিন্তু এখন দেখছি শুধু শ বাড়ি নয়, সেখানকার মানুষজন সম্পর্কেও স্থানীয়দের ধারণা খুব খারাপ। আসলে কেমন লোক এবেনের ব্যালকোর ? শ বাড়িতে গড়বড়টাই বা কোথায় ? ও বাড়ির নাম শুনে চমকে যাচ্ছে কেন সবাই ? এখন আমি কি করবো। এসেনডিনে বৃদ্ধ রাজপ্রতিনিধির কাছে ফিরে যাবো আবার ?

খানিকক্ষণ ভাবলাম। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলাম, না, ফিরে যাওয়া চলবে না। শ বাড়ি আর তার মানুষজন সম্পর্কে ভালো মতো জানার আগে তো নয়ই।

বিকেল হয়ে গেছে। একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে। এই সময় এক বৃদ্ধার সাথে দেখা হলো। বেশ শক্ত-পোক্ত বুড়ি। কালো পোশাক পরনে। চেহারায় ফুটে বেরুচ্ছে দুনিয়ার যাবতীয় জিনিসের প্রতি বিতৃষ্ণা।

সেই একই কথা জিজ্ঞেস করলাম বুড়িকে। 'শ দের বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন ?'

সাঁ করে ঘুরলো বুড়ি আমার দিকে। আগুন ঝরছে যেন চোখ থেকে। ঝটকা মেরে হাত তুলে ইশারা করলো নিচে উপত্যকার দিকে।

বুড়ির ইশারা অনুসরণ করে তাকালাম আমি। প্রথমেই চোখে পড়লো সোনালী ফসলের মাঠ। গম পাকছে। তারপর সবুজ গাছের সারি. ছোট্ট সুন্দর একটা ঝরনা। চমৎকার একটা উপত্যকা যাহোক।

'ঐ যে, ঐ যে, আরো ওদিকে !' চিৎকার করলো বুড়ি।

এবার দেখতে পেলাম বাড়িটা। বিরাট একটা দালান দূর থেকে পাথরের স্তূপের মতো দেখাচ্ছে। ভেঙে গেছে জায়গায় জায়গায়। চমৎকার সবুজ উপত্যকার বুকে কেমন যেন বেমানান লাগছে। কোনো পথ চোখে পড়লো না ওখানে যাওয়ার, একবিন্দু ধোঁয়া উঠছে না কোনো চিমনি থেকে। কাছাকাছি কোনো গাছ নেই, বাগান নেই। কেমন একটা বিষণ্ণ আবহাওয়া যেন ঘিরে রেখেছে বাড়িটাকে।

দমে গেলাম আমি। কোনো রকমে উচ্চারণ করলাম, 'ওটা !'

'হ্যাঁ, ওটা !' বললো বুড়ি। 'ওটাই শ বাড়ি। রক্ত দিয়ে তৈরি, রক্তই আবার মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে। এই যে দেখ,' আবার চেঁচালো সে, 'এই আমি থু ফেলছি মাটিতে, অভিশাপ দিচ্ছি, ধসে পড়বে ঐ বাড়ি। মালিকের সাথে যদি দেখা হয় বোলো, জ্যানেট-ক্লাউসটন অভিশাপ দিয়েছে ওকে, ওর বাড়িকে, ওর যা আছে সব কিছুকে, ঐ বাড়িতে যারা আছে সবাইকে—সব, সব ধ্বংস হয়ে যাবে।'

চলে গেল বৃদ্ধা।

বরফের মতো জমে যাওয়ার অবস্থা হলো আমার। হঠাৎ করেই যেন দুর্বল হয়ে গেল পাগুলো। বসে পড়লাম। বসে বসে ভাবার চেষ্টা করছি, কিন্তু গুছিয়ে ভাবতে পারছি না কিছু। উঠে যে রওনা হবো, মনে হচ্ছে তা-ও পারবো না।

সূর্য ডুবে গেল। সেখানেই বসে রইলাম আমি। অভিশপ্ত শ বাড়ির দিকে চোখ। হঠাৎ খেয়াল করলাম, সরু একটা ধোঁয়ার রেখা বেরিয়ে আসছে একটা চিমনি দিয়ে। কেউ আগুন জ্বেলেছে। কেউ আছে তাহলে ঐ বাড়িতে। কে ?

জানতে হলে যেতে হবে ওখানে।

উঠলাম আমি। অস্পষ্ট একটা পায়ে চলা পথ চলে গেছে ঘাসের ভেতর দিয়ে। খুবই অস্পষ্ট পথ। কালে-ভদ্রে কেউ হয়তো যাওয়া-আসা করে এখান দিয়ে তাই এখনো টিকে আছে, নয় তো কবেই চাপা পড়ে যেতো বেড়ে ওঠা ঘাসের নিচে। সম্ভবত এটাই একমাত্র পথ ঐ বাড়িতে যাওয়ার। কারণ বেশ খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও আর কোনো পথের চিহ্ন নজরে পড়লো না।

ঐ পথ ধরে এগোলাম। কিছুক্ষণ হাঁটার পর দুটো পাথরের থাম দেখতে পেলাম এক জায়গায়। এখন জীর্ণ দশা, তবে এককালে যে ওগুলো সুন্দর ছিলো তা বোঝা যায়। দুটোর দূরত্ব দেখে অনুমান করলাম একটা সিংহদরজা তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছিলো। থাম দুটো থেকে দুদিকে সীমানা দেয়াল চলে যাওয়া সংগত ছিলো কিন্তু ভাঙাচোরা বেড়া ছাড়া আর কিছু নজরে পড়লো না। এগিয়ে চললাম আমি বাড়িটার দিকে।

আরেকটু কাছে পৌঁছানোর পর দেখলাম, যতটা ভেবেছিলাম তত জীর্ণদশা নয় বাড়িটার। পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পূর্ণ করা হয়নি তাই অমন ধসে পড়া ধসে পড়া লাগছিলো দূর থেকে। ওটার একাংশে ছাদ নেই, কখনো দেওয়া হয়নি। বেশির ভাগ জানালায় ই কাচ নেই, অথবা থাকলেও ভাঙা। বাদুড়, চামচিকা ঢুকছে বেরোচ্ছে সে সব জানালা দিয়ে, যেন পায়রার বাসায় ঢুকছে বেরোচ্ছে পায়রারা।

এই আমার স্বপ্নের প্রাসাদ! ওহ, এর চেয়ে কত ভালো আমাদের এসেনডিনের শাদামাঠা ছোট্ট বাড়িটা! বাবা যখন বেঁচে ছিলেন সন্ধ্যার পর প্রতিটা জানালা-ই আলোয় ঝকমক করতো। বড় একটা

আগুন জ্বলতো ভেতরে। বাড়িতে কেউ এলে হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানাতেন বাবা, ধনী-দরিদ্রের বাছ-বিচার করতেন না।

রাত হয়ে গেছে। অন্ধকার নেমে এসেছে প্রকৃতিতে। ধীর পায়ে এগোলাম বাড়িটার আরো কাছে। নিচের দিকের তিনটে জানালায় আলো দেখতে পেলাম। লম্বা সরু জানালাগুলোর এক পাশ থেকে অন্য পাশে দ্রুত সরে যাচ্ছে আলো। ঘরের ভেতর আগুন জ্বালানো হয়েছে সম্ভবত। পা টিপে টিপে আরেকটু এগোলাম। কান খাড়া করতেই খুট-খাট দু-একটা শব্দ শুনতে পেলাম। বাসন-পেয়ালা নাড়া-চাড়া করছে কেউ। রাতের খাবার তৈরি করছে বোধহয়। একটু পরেই কাশির আওয়াজ। ব্যস। আর কোনো শব্দ না। কোনো কথা না, এমন কি কুকুরের ডাকও না।

অস্পষ্ট আলোয় সামনে দেখতে পাচ্ছি মজবুত কাঠের দরজাটা। মোটা মোটা পেরেক মেরে আরো মজবুত করার চেষ্টা করা হয়েছে। দুরু দুরু বুকে হাত তুললাম আমি। আস্তে টোকা দিলাম দরজায়। একবার।

অপেক্ষা করছি। কবরের মতো নিস্তব্ধ বাড়ির ভেতরটা। টোকা দেয়ার পর প্রায় এক মিনিট পেরিয়ে গেছে। মাথার ওপর বাদুড়ের ডানা ঝাপটানো ছাড়া অন্য কোনো আওয়াজ শুনতে পাইনি। আবার টোকা দিলাম। একটু জোরে। এবারও কোনো সাড়া নেই। ঘরের ভেতর একটা ঘড়ি টিক টিক করছে। সেই মৃদু আওয়াজটা পর্যন্ত আমি শুনতে পাচ্ছি। অথচ, এত জোরে টোকা দিলাম, শুনতে পেলো না ভেতরের লোকটা!

দ্বিধায় পড়ে গেছি। চলে যাবো? কিন্তু কিছুতেই সায় দিতে চাইলো না মন। রেগে উঠলাম। মৃদু টোকার বদলে লাথি হাঁকা—

লাম সবেগে। সেই সাথে চিৎকার: 'মিস্টার ব্যালফোর আছেন নাকি?'

মাথার ওপর কাশির আওয়াজ শুনে মুখ উঁচু করলাম আমি। লম্বা রাতের টুপি পরা এক লোকের মুখ আর একটা বন্দুকের নল ওপরের জানালায়।

'গুলি ভরা আছে এতে,' বললো একটা কণ্ঠস্বর।

'আমি মিস্টার এবেনের ব্যালফোরের জন্যে একটা চিঠি নিয়ে এসেছি। উনি আছেন?'

'কে পাঠিয়েছে?' বন্দুকের নলে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে জিজ্ঞেস করলো লোকটা।

ভেতরে ভেতরে ক্ষেপে উঠছি আমি। বেশ ঝাঁঝের সাথেই জবাব দিলাম। 'যে-ই পাঠাক, মিস্টার ব্যালফোর আছেন নাকি?'

'চিঠিটা দরজার গোড়ায় রেখে কেটে পড়ো।'

'অসম্ভব। মিস্টার ব্যালফোরের হাতে দেবো চিঠি। সে রকমই নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমাকে।'

'কি নাম তোমার?' আচমকা জিজ্ঞেস করলো লোকটা।

'ডেভিড ব্যালফোর। নিবাস এসেনডিন।'

নিঃসন্দেহে লোকটা চমকে উঠেছে। বন্দুকটা জানালার চৌকাঠে বাড়ি খাওয়ার শব্দ শুনলাম। তারপর সব চুপচাপ। অনেকক্ষণ পর আবার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো ওপর থেকে। এবার একটু যেন কৌতূহলের ছোঁয়া লেগেছে তাতে।

'তোর বাপ কি মরে গেছে?'

ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম প্রশ্নটা শুনে। জবাব দেয়ার মতো কোনো কথা সেই মুহূর্তে খুঁজে পেলাম না।

'হ্যাঁ, তা-ই সম্ভব,' বলে চললো লোকটা, 'মরে গেছে ও। সে-

জন্যেই তুই এসেছিস আমার দরজায়। বেশ...' আবার কিছুক্ষণের বিরতি, 'তোকে আমি ঢুকতে দেবো।'

জানালার কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা।

তিন

বেশ জোরে শিকল টানার আওয়াজ হলো ভেতরে। তারপর ভারি ছিটকিনি খোলার শব্দ। সাবধানে দরজা মেললো লোকটা। আমি ভেতরে ঢুকতেই বন্ধ করে দিলো আবার। ছিটকিনি টেনে দিলো।

'যা, রান্নাঘরে চলে যা,' বললো লোকটা, 'সাবধান, কোনো জিনিসে হাত দিবি না।'

ছিটকিনি লাগিয়ে নিশ্চিন্ত হয়নি সে, শিকলগুলো টানতে শুরু করলো এবার। আর আমি অন্ধকারে কোনো রকমে হাতড়ে হাতড়ে এগোলাম রান্নাঘরের দিকে। একটু দূরে এককামরায় অনুজ্জ্বল আলো দেখতে পাচ্ছি। ধারণা করলাম, ওটাই রান্নাঘর।

হ্যাঁ ওটাই রান্নাঘর। জীবনে আমি এমন শ্রীহীন তৈজসপত্রহীন রান্নাঘর দেখিনি। আধ ডজন বাসন সাজানো রয়েছে একটা তাকে; ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় একটা টেবিল, একটা টুল, এক পাশে ছোট একটা আলমারি আর কয়েকটা বাক্স, সিন্দুক ব্যস। আলমারি আর সিন্দুকগুলো তালা মারা। টেবিলের ওপর রাতের খাবার সাজানো। এক বাটি পরিজ, একটা চামচ আর এক মগ বিয়ার। এছাড়া আর কিছু নেই সে ঘরে।

শিকল লাগিয়ে রেখে রান্নাঘরে এলো লোকটা। এই প্রথম তাকে আলোয় দেখলাম। হিংসুটে ধরনের চেহারা। ছোট খাটো, রোগা, কুঁজো এক বুড়ো। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, বয়স পঞ্চাশ থেকে সত্তরের ভেতর যে কোনো কিছু হতে পারে। মুখটার রঙ কাদার মতো। ছেঁড়া-খোড়া একটা জামার ওপর রাতের পোশাক পরে আছে। সব মিলিয়ে অদ্ভুত। সবচেয়ে বিরক্তিকর লোকটার দৃষ্টি। সেই থেকে দেখছে আমাকে, কিন্তু একবারও ভালো করে তাকায়নি মুখের দিকে। কে এ? বুড়ো কোনো চাকর সম্ভবত।

'খিদে পেয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো সে, দৃষ্টি পরিজের বাটির দিকে।

'ওটা নিশ্চয়ই আপনার রাতের খাবার,?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'দেখ, ওটা ছাড়াও আমি চালিয়ে নিতে পারবো। বিয়ারটুকুই যথেষ্ট। আমার কাশির জন্যে খুব উপকারী ও জিনিস।'

এক চুমুকে মগের প্রায় অর্ধেক খালি করে ফেললো সে। কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরালো না আমার ওপর থেকে। তারপর হঠাৎই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'কই দেখি চিঠিটা?'

'ওটা আপনার জন্যে নয়। মিস্টার এবেনের ব্যালফোরকে দেবো ওটা আমি।'

'তোর কি মনে হয়, আমি কে? দে, আলেকজাণ্ডারের চিঠিটা।'

'আপনি—আপনি আমার বাবার নাম জানেন?'

'জানি না মানে? ও আমার আপন মায়ের পেটের ভাই, ওর নাম জানবো না! আমি তোর চাচা, ডেভি, আর তুই আমার ভাইপো। দে এবার চিঠিটা। তারপর বোস, পেটটা ভরে নে।'

আমার বয়েস যদি আর কয়েক বৎসর কম হতো, নির্ঘাৎ আমি কেঁদে ফেলতাম। হ্যাঁ, লজ্জায়, দুঃখে, হতাশায় কেঁদে ফেলতাম। এই

জঘন্য বুড়োটা আমার চাচা ! কোনো রকমে চিঠিটা তার হাতে দিয়ে বসে পড়লাম টেবিলে, কিন্তু ওর সেই পরিজে হাত দিতে পারলাম না কিছুতেই।

আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে চিঠিটা উল্টেপাল্টে দেখলো আমার চাচা।

'কি আছে এতে জানিস ?' আচমকা জিজ্ঞেস করলো সে।

'নিজেই তো দেখতে পাচ্ছেন,' বললাম আমি, 'সিলমোহর ভাঙা হয়নি এখনো।'

'বুঝলাম। কিন্তু তুই এখানে এসেছিস কেন ?'

'চিঠিটা দেয়ার জন্যে।'

'হাঁ ! শুধু এজন্যে এতোটা পথ হেঁটে এসেছিস তুই ! বললি আর বিশ্বাস করলাম ? নিশ্চয়ই কিছু একটা আশা নিয়ে এসেছিস, ঠিক কিনা ?'

'আঁ, হ্যাঁ, স্বীকার করছি, আশা করেছিলাম আপনি হয়তো আমাকে সাহায্য করবেন। কিন্তু—কিন্তু, আমি পথের ভিখিরী নই। আপনি সাহায্য না করলেও কিছু এসে যাবে না। আমার এমন অনেক বন্ধু আছে যারা আমাকে সাহায্য করবে।' বেশ ঝাঁঝের সাথে মাথা উঁচু করে বললাম কথাগুলো।

'আহা, রেগে যাচ্ছিস কেন ? আমরাও ভালো বন্ধু হবো, তুই আর আমি।' হঠাৎ করেই যেন পরিজের ওপর চোখ পড়লো এবেনের চাচার। 'তুই খাবি না পরিজ ? তাহলে সর, আমি খাই।' বলে আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিলো টুল থেকে। নিজে বসে খেতে শুরু করলো। 'চমৎকার খাবার এই পরিজ, বুঝলি, ডেভি।' এক চুমুক বিয়ার খেলো সে। 'যদি পিপাসা পায়, ঐ পিপেতে পানি আছে,

খেয়ে নিস।'

প্রচণ্ড রাগে কথা বলার শক্তিও যেন লুপ্ত হয়েছে আমার। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলাম দুই পায়ের ওপর। তাকিয়ে আছি ওর দিকে। গোগ্রাসে গিলে চলেছে পরিজটুকু। একটু পরপরই তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ফেলছে আমার ওপর। একবার চোখাচোখি হয়ে গেল আমাদের। সঙ্গে সঙ্গে চোখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকালো ও। কিন্তু এর ভেতরেই আমি দেখে ফেলেছি, ওর দৃষ্টিতে ভয়।

একটু আশ্চর্য হলাম মনে মনে। কি জন্যে ভয় পাচ্ছে এবেনের চাচা? অপরিচিত লোক মাত্রই কি ওর কাছে ভয়ের জিনিস? আমি যদি থেকে যাই এখানে তাহলে কি ভয় কমবে ওর?

এসব কথা ভাবছি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, এমন সময় তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো এবেনের চাচা, 'অনেক দিন আগে মারা গেছে তোর বাপ?'

'তিন সপ্তাহ।'

'চাপা লোক ছিলো আলেকজাণ্ডার, ভীষণ চাপা, আর শান্ত। ছেলে বেলায় কখনো খুব বেশি কথা বলতো না। আমার সম্পর্কে কিছু বলেনি তোকে?'

'না, স্যার। আপনি বলার আগ পর্যন্ত আমি জানতাম ই না বাবার কোনো ভাই আছে।'

'ছি—ছি—ছি, শোনো তো দেখি কি কথা! আচ্ছা শ পরিবার সম্পর্কেও কিছু বলেনি কোনো দিন?'

'না, স্যার।'

শুনে বেশ খুশি হলো এবেনের চাচা। উঠে দাঁড়িয়ে এক লাফে চলে এলো আমার কাছে। কাঁধে একটা চাপড় মেরে বললো, 'বেশ বেশ, খুব ভালো ছেলে তুই, ডেভি, আমার সাথে তোর বনবে ভালো।

এখন চল, শুতে যাবি।'

অন্ধকারের ভেতর দিয়ে আমাকে নিয়ে চললো চাচা। আশ্চর্য, কোনো বাতি জ্বাললো না। গভীর ভাবে একটা শ্বাস নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলো। শব্দ শুনে আন্দাজে অনুসরণ করলাম আমি। সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে একটা দরজার সামনে দাঁড়ালো। হোঁচট খেতে খেতে কোনো মতো সামলে নিলাম আমি। দরজার তালা খুললো চাচা। তারপর আমাকে একটা ঠেলা দিয়ে বললো, 'ভেতরে যা। এটা তোর ঘর।'

দু'পা এগিয়েই থেমে গেলাম আমি। অনুনয়ের সুরে বললাম, 'একটা বাতি দেয়া যাবে আমাকে?'

'বাতি! বাতি দিয়ে আবার কি করবি? চাঁদ আছে না আকাশে?'

'কোথায় চাঁদ? ঘুটঘুটে অন্ধকার, বিছানাটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না!'

'দেখ, আমার বাড়িতে বাতি জ্বলুক তা আমি চাই না। ভয়ঙ্কর জিনিস এই বাতি। যে কোনো সময় আগুন লেগে যেতে পারে। আর যা-ই করি, বাতি কখনো জ্বালবো না আমি। শুভরাত্রি, ডেভি।'

কোনো কথা বলার বা প্রতিবাদ করার সুযোগ পেলাম না আমি। দরজা টেনে দিলো এবেনের চাচা। বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেয়ার শব্দ পেলাম।

হতবুদ্ধি অবস্থা আমার। হাসবো না কাঁদবো বুঝতে পারছি না। বরফের মতো ঠাণ্ডা ঘরটা। আর বিছানা! কোনো মতে হাতড়ে হাতড়ে যখন পৌঁছুলাম ওটার কাছে, স্পর্শ করে বুঝলাম, কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় এমন জঘন্য স্যাঁতসেঁতে বিছানায় ঘুমানো। ভাগ্য ভালো আমার, পুঁটুলিটা সঙ্গে আছে। একটা কম্বল আছে তার ভেতরে। কম্বলটা বের করে মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম মাটিতে। ঘুমিয়ে গেলাম সাথে সাথে।

পরদিন সূর্য উঁকি দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেগে গেলাম আমি। শুয়ে শুয়েই চোখ বুলালাম চারপাশে। দেখলাম বড়সড় একটা কামরায় শুয়ে আছি। সুদৃশ্য কারুকাজ করা দামী আসবাব পত্রে ঠাসা কামরাটা। বোঝা যায় দশ বা বিশ বছর আগে চমৎকার একটা শোয়ার ঘর ছিলো। অথচ এখন, ইঁদুর-মাকড়ার বাসা। তিনটে সুন্দর জানালা একদিকে। কাচগুলো সব ভাঙা। হু-হু করে ঠাণ্ডা ঢুকছে তার ভেতর দিয়ে। গায়ের ওপর থেকে কম্বল সরাতেই শীত করতে লাগলো।

এদিকে বাইরে, বেশ খানিকটা ওপরে উঠে এসেছে সূর্য। এখন আর কম্বল মুড়ি দেয়া যায় না। উঠে পড়লাম আমি। চিৎকার করে ডাকলাম চাচাকে। দরজা খুলতে বললাম। সেই সাথে ধাক্কা দিতে লাগলাম কপাটে। যতক্ষণ না এবেনের চাচা এসে দরজা খুললো ততক্ষণ চালিয়ে গেলাম চিৎকার আর ধাক্কা।

আমাকে বাড়ির পেছন দিকে নিয়ে গেল চাচা। বললো, 'ঐ যে, ওখানে একটা কুয়ো আছে উঠোনের পাশে। ইচ্ছে হলে মুখ হাত ধুয়ে নিতে পারিস।' বলে আর দাঁড়ালো না ও, ঢুকে পড়লো বাড়ির ভেতরে।

হাত মুখ ধুয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলাম। দেখি এবেনের চাচা আগুন জ্বেলে পরিজ রাঁধতে বসেছে। টেবিলের ওপর দুটো বাটি আর দুটো শিং এর চামচ। বিয়ারের মগ কিন্তু একটাই।

আমাকে বিয়ারের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে কিনা জানি না, চাচা বলে উঠলো, 'তুই-ও একটু বিয়ার খাবি নাকি?'

'না, সাধারণত আমি খাই বিয়ার। তবে না হলেও কোনো অসুবিধা নেই। আপনাকে কষ্ট করতে হবে না।'

'আরে, না না, কষ্ট আবার কি?' বিনয়ের অবতার যেন আমার

চাচা। 'দাঁড়া, তোকেও দিচ্ছে খানিকটা।'

তাক থেকে আরেকটা মগ নিয়ে এলো চাচা, কিন্তু বিয়ার না। নিজের মগ থেকে ঠিক অর্ধেক ঢেলে দিলো নতুন মগটায়। তারপর আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বললো, 'নে, খা।'

খাওয়া শেষ করে উঠে পড়লো এবেনের চাচা। আলমারির কাছে গিয়ে একটা দেরাজের তালা খুলে সামান্য তামাক আর একটা মাটির পাইপ বের করলো। তারপর আবার তালা মেরে দিলো দেরাজে। পাইপের ভেতর তামাক ভরতে ভরতে একটা জানালার কাছে গিয়ে বসলো। বাইরে থেকে রোদ এসে পড়ছে সেখানে। পাইপটা ধরিয়ে আয়েশ করে টানতে লাগলো চাচা।

'তোর মা কোথায়রে?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো সে।

'মা-ও মারা গেছেন।'

'আহা! চমৎকার মেয়ে ছিলো।'

চুপ করে গেল চাচা। অনেকক্ষণ পর আবার আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোর অনেক বন্ধু আছে বলছিলি, ওরা কারা?'

আগের রাতে আমি ওকে বলেছিলাম আমার অনেক বন্ধু। কিন্তু আসলে তো আমার বন্ধু একজনই, মিস্টার ক্যাম্পবেল; এসেনডিনে রাজ-প্রতিনিধি। যাহোক আসল কথা আর ফাঁস করলাম না। তাতে চাচার কাছে আমার ওজন কমে যেতে পারে। একটু মিথ্যে করেই বললাম, 'ক্যাম্পবেল পদবীর কয়েকজন ভদ্রলোক।'

শুনে একটু যেন চিন্তায় পড়ে গেল এবেনের চাচা। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো। তারপর বললো, 'বুঝলি, ডেভিড, আমি তোকে সাহায্য করবো, তবে আগে কিছু সময় দরকার আমার। এ নিয়ে একটু ভাবনা-চিন্তা করতে হবে। তোকে রাজ-প্রতিনিধি বানাবো, না আইন-

জীবী বানাবো···? তুই হয়তো চাস সৈনিক হতে···সময় দরকার, বুঝলি। ভেবে-চিন্তে ঠিক জিনিসটা হতে হবে তোকে। তবে এ সম্পর্কে তোর বন্ধুদের, মানে ঐ ক্যাম্পবেলদের কিন্তু কিছু জানাতে পারবি না। ওদের কাছে বা কারো কাছেই কোনো চিঠি লেখা চলবে না। যদি লিখিস বা জানাস, ঐ যে দরজা ; এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে জানাবি।'

রাগে সারা শরীর জ্বলে গেল আমার। 'দেখুন, এবেনের চাচা, ঝাঁঝের সাথে বললাম, 'আমি এখানে এসেছি কেবল বাবা পাঠিয়েছেন বলে। এখন যদি আপনি দরজা দেখান, চলে যাবো। হ্যাঁ, স্যার, খুব খুশি মনেই চলে যাবো।'

সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল ওর মুখভঙ্গি। আমার কথা শুনে মুষড়ে পড়েছে যেন।

'দাঁড়া দাঁড়া, অত ক্ষেপে যাসনে, ক'টা দিন ধৈর্য ধর, এর ভেতর আমি ঠিক করে ফেলবো কি করতে হবে। তার আগে কাউকে জানাসনে তুই এখানে আছিস, কেমন ? কথা দে, জানাবি না।'

'বেশ,' কথা দিলাম আমি। 'আপনি যদি সত্যিই আমাকে সাহায্য করতে পারেন আমি খুবই আনন্দিত এবং কৃতজ্ঞ হবো।'

এরপর আমি আমার বিছানার স্যাঁতসেঁতে অবস্থার কথা বললাম। শেষে যোগ করলাম, 'তোষকটা বাইরে এনে রোদে দিতে চাই।'

সঙ্গে সঙ্গে রেগে গেল চাচা।

'বাড়িটা কি তোর না আমার ?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচালো সে। তারপর হঠাৎই বদলে গেল তার গলা। 'না রে, ডেভি, আমি ঠিক ওকথা বলতে চাইনি। তুই আমার ভাইপো। যত যা-ই হোক পানির চেয়ে রক্ত অনেক ঘন। তাছাড়া তুই আর আমি ছাড়া এবংশের আর

কে আছে ?'

নিজের সম্পর্কে, আমাদের বংশের অতীত মর্যাদা আর মহত্ত্ব সম্পর্কে অনেক কথা বললো চাচা। তার বাবা, মানে আমার দাদা নাকি প্রচুর টাকা ব্যয় করেছিলেন বাড়িটার পেছনে। 'আমি পরে বন্ধ করে দিয়েছি সব কাজ,' বলে চললো সে। 'খামোকা টাকা নষ্ট। এত বড় বাড়ি দিয়ে কি হবে ? লোকে যে যা-ই বলুক, আমি বাবা কিছুতেই আমার টাকা উড়িয়ে দিতে পারবো না।'

এই সময় আমার মনে পড়ে গেল জ্যানেট ক্লাউসটনের কথা। চাচাকে বললাম বুড়ি যা যা বলেছিলো সব। কিছুই বাদ দিলাম না। তার অভিশাপের কথা পর্যন্ত বললাম।

'বুড়ি একটা ডাইনী।' আবার ক্ষেপে গেল চাচা। 'হ্যাঁ ডাইনী। ও আমাকে ঘৃণা করে কারণ ওর কাছে আমি টাকা পেতাম ; টাকা দিতে পারেনি বলে ওর কুটিরটা নিয়ে নিয়েছিলাম। আমার কি দোষ বল, টাকা নেবে অথচ দেবে না। টাকা কি এতই সস্তা ? ও আমাকে অভিশাপ দিয়েছে, তাই না ? এ জন্যে ওকে ভুগতে হবে। আমি বলছি, ওকে শাস্তি পেতেই হবে। আমি নিজে গিয়ে রাজ-প্রতিনিধিকে জানাবো।'

উঠে একটা সিন্দুকের তালা খুললো এবেনের চাচা। বহু পুরনো একটা নীল রঙের কোট আর হ্যাট বের করলো। তারপর সিন্দুকে তালা লাগিয়ে দিয়ে কোট পরলো, মাথায় চাপালো হ্যাটটা। ঘরের কোনা থেকে একটা ছড়ি তুলে নিয়ে রওনা হলো দরজার দিকে।

দরজার কাছে গিয়ে হঠাৎ থেমে দাঁড়ালো চাচা। ঘুরে তাকালো আমার দিকে।

'তোকে তো একা রেখে যেতে পারি না খালি বাড়িতে। তালা

মেরে রেখে যাবো তোকে।'

রক্ত উঠে এলো আমার মুখে। 'যদি তাই মেরে রেখে যান,' চিৎকার করে বললাম আমি, 'তাহলে মনে রাখবেন, এখানেই শেষ আপনার সাথে আমার বন্ধুত্ব।'

ফ্যাকাশে হয়ে গেল ওর চেহারা। একটা ঢোক গিলে বললো, 'এমন করলে তো চলবে না, ডেভি। আমার সাহায্য পেতে হলে আমার কথা একটু-আধটু শুনতে হবে।'

'দেখুন, আপনি যদি ভেবে থাকেন সাহায্য করার বিনিময়ে যা খুশি তাই করবেন আমার সাথে, তাহলে ভুল করবেন।'

ফ্যাকাশে মুখটা আরেকটু ফ্যাকাশে হলো এবেনের চাচার। খেয়াল করলাম কাঁপতে শুরু করেছে সে। ভয়ে না রাগে বুঝতে পারলাম না। কিছুক্ষণ পরে অনেক কষ্টে একটুকরো হাসি টেনে আনলো মুখে।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' বললো চাচা 'আমি তাহলে বেরোচ্ছি না আজ।'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, চাচা! চোরের সঙ্গে মানুষ যেমন করে আপনি তেমন ব্যবহার করছেন আমার সাথে। এর মানে কি? আপনি পছন্দ করেন না আমাকে, চান না আমি এ বাড়িতে থাকি। তাহলে কেন আমাকে রাখতে চাইছেন এখানে? কেন চলে যেতে দিচ্ছেন না আমার বন্ধুদের কাছে?'

'না না, ডেভিড, অমন করে বলিস না। আমি সত্যিই তোকে পছন্দ করি। তুই আমার ভাইয়ের ছেলে, তোকে সাহায্য করা তো আমার কর্তব্য। চাই-ও করতে। কিন্তু তার আগে কয়েকটা দিন তো তোকে ধৈর্য ধরতেই হবে। চুপচাপ কিছু দিন থাক, তারপর বুঝতে

পারবি, সত্যিই আমি তোর ভালো চাই।'

বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করলাম না আমি ওর কথা। তবু বললাম, ঠিক আছে থাকবো। যত যা-ই হোক, আপনি আমার চাচা, বাবার ভাই। অচেনা অজানা লোকের চেয়ে আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে সাহায্য নেয়াই ভালো। কিন্তু আপনার সঙ্গে যদি কখনও খটাখটি লাগে তাহলে, বলে দিচ্ছি, আপনার দোষেই লাগবে, আমার দোষে নয়।'

মনে হলো, কথগুলো শুনে বেশ স্বস্তি পেলো চাচা।

চার

শুরুটা এমন কুৎসিত হলেও বাকি দিনটা ভালোভাবেই কেটে গেল। দুপুরে খেলাম ঠাণ্ডা পরিজ, রাতে গরম। এই পরিজ আর জঘন্য এক ধরনের বিয়ারই আমার চাচার একমাত্র খাদ্য।

সারাটা দিন আমাকে চোখে চোখে রাখলো সে। মুহূর্তের জন্যেও দৃষ্টির আড়ালে যেতে দিলো না, যদিও কথা বললো খুবই সামান্য। দীর্ঘ নীরবতার পর একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে মারে। কিন্তু যখনই আমি আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু আলাপ করতে চাইলাম তখনই এ কথা সে কথা বলে প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিলো সে। কেমন ভয় ভয় করতে লাগলো আমার।

দুপুরের পর এক ফাঁকে ওকে রেখে রান্নাঘরের ঠিক পাশের ঘরটায় ঢুকলাম আমি। প্রচুর বই দেখলাম সেখানে। ল্যাটিন, ইংলিশ দু'-ভাষাতেই। তক্ষুণি আমি বসে গেলাম বই নিয়ে। বিকেলটা একটু স্বস্তিতেই কাটলো।

একটার পর একটা বই উল্টে যাচ্ছি। যেগুলো পড়ছি না সেগুলোও একটু উল্টেপাল্টে দেখছি। হঠাৎ অদ্ভুত একটা জিনিস আবিষ্কার করে চমকে গেলাম। বাচ্চাদের একটা ছবির বই। বইটার প্রথম পৃষ্ঠায়

আমার বাবার হাতে লেখা এই কথাগুলো : 'আমার ভাই এবেনেরের পঞ্চম জন্মদিনে।'

আশ্চর্য! আমি ভেবেছিলাম আমার বাবা দু'ভাইয়ের ভেতর ছোট। কিন্তু এখন দেখছি, এবেনের চাচার বয়স যখন পাঁচ তখনই বাবা পাকা হাতে লিখতে পারেন বড়মানুষের মতো! তিন চার বছরের বাচ্চার হাতের লেখা কিছুতেই অমন পাকা হতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে একটা সন্দেহ উঁকি দিলো আমার মনে : বাবা আসলে ছোট না বড়?

যদি বড় হন, শ বাড়ির আইনসম্মত মালিক তিনি, এবং তাঁর মৃত্যুর পর এখন আমি।

এরপর পড়া মাথায় উঠলো আমার। কিছুতেই মাথা থেকে তাড়াতে পারছি না চিন্তাটা। অবশেষে সন্ধ্যার সময় আবার গিয়ে ঢুকলাম রান্নাঘরে। সেই জঘন্য পরিজ আর বিয়ার টেবিলে সাজিয়ে বসে আছে চাচা। সোজাসুজি তাকে জিজ্ঞেস করলাম : 'আমার বাবা কি একটু তাড়াতাড়ি লেখাপড়া শিখেছিলেন?'

'আলেকজাণ্ডার? দুর-দুর! আমি ওর চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি শিখেছি। ছোটবেলায় খুব চালাক ছিলাম আমি। তোর বাপ যখন পড়তে শিখেছে আমিও সেসময়-ই শিখেছি।'

ব্যাপারটা আরো অদ্ভুত মনে হলো আমার কাছে। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। এমন সময় হঠাৎ একটা সম্ভাবনার কথা উঁকি দিলো মনে।

'আচ্ছা, আপনি আর বাবা কি যমজ ভাই?'

টুল থেকে লাফিয়ে উঠলো এবেনের চাচা। চামচটা সশব্দে পড়ে গেল মেঝেতে। ঝট করে হাত বাড়িয়ে আমার কোটের সামনেটা ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চিৎকার করলো, 'একথা জিজ্ঞেস করলি কেন?'

এই প্রথম আমার চোখে চোখে তাকালো সে। দেখলাম সে চোখের দৃষ্টি শয়তানী আর নিষ্ঠুরতায় ভরা।

উত্তেজিত হলাম না আমি। বরং একটু যেন বেশি শান্ত হয়ে গেছি চাচাকে ক্ষেপে উঠতে দেখে। আগেও কয়েকবার ক্ষেপেছে লোকটা আমার ওপর, কিন্তু এবারের ক্ষেপাটা অন্যরকম।

'গা থেকে হাত সরান,' শান্ত গলায় বললাম আমি। 'এমন কিছু আমি বলিনি যার জন্যে আপনি এমন করতে পারেন।'

আমার শীতল কণ্ঠস্বর শুনে একটু যেন থমকালো চাচা। ধীরে ধীরে ছেড়ে দিলো কোট।

'তোর বাপ সম্পর্কে কিছু বলবি না আমাকে,' ভেঙে পড়া গলায় বললো সে। 'আমি সহ্য করতে পারি না।' ধীরে ধীরে বসে পড়ে অসুস্থ মানুষের মতো কাঁপলো কিছুক্ষণ, তারপর দুঃখী দুঃখী ভঙ্গি করে যোগ করলো, 'ঐ একটাই ভাই ছিলো আমার।'

বললো বটে তবে ওর গলায় আমি প্রাণের ছোঁয়া পেলাম না। এরপর মাটি থেকে চামচ কুড়িয়ে নিয়ে আবার খেতে শুরু করলো সে।

হঠাৎ করে এবেনের চাচার এমন ক্ষেপে ওঠা, আবার পরমুহূর্তে বাবার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করায় একই সাথে ভয় আর আশার দোলায় দুলতে লাগলাম আমি। আশা, লোকটা হয়তো সত্যিই বাবাকে পছন্দ করতো, ভালোবাসতো সুতরাং আমাকেও পছন্দ করবে। ভয়, এমন আচরণ যে করতে পারে নিশ্চয়ই সে পাগল ; তার মানে বিপজ্জনক। কখন কি করে বসে ঠিক নেই। কিন্তু, বাবাকে যদি পছন্দই করতো, তাহলে তার একমাত্র ছেলে, যে প্রায় পথের ভিখিরি, তার সাথে এমন আচরণ করছে কেন লোকটা ? নাকি ও লোকগাথার সেই দুষ্ট চাচার মতো, যে ভাইপোর উত্তরাধিকার ঠকিয়ে নিয়ে নিয়েছিলো ? আমিই

কি শ বাড়ির আইনসম্মত উত্তরাধিকারী ?

বসে বসে তাকে দেখতে লাগলাম। সে-ও একটু পর পরই আড়চোখে দেখছে আমাকে। কোনো কথা না বললেও হাব ভাবে মনে হলো নিশ্চয়ই কোনো বদ মতলব আঁটছে মনে মনে। যতই আমি দেখতে লাগলাম ততই ধারণা বিশ্বাসে পরিণত হতে লাগলো।

অবশেষে খাওয়া শেষ হলো তার। বাসনগুলো সরিয়ে রেখে পাইপ জ্বালিয়ে বসলো। ঠিক সকালের মতো, চিমনির এক কোনায় আমার দিকে পিঠ দিয়ে।

'ডেভি!' অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভাঙলো এবেনের চাচা। 'আমি ভাবছি···।' আবার চুপচাপ। কিছুক্ষণ পর আবার কথা বললো সে, 'অনেক দিন আগে, তোর জন্মেরও আগে তোর বাপকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিছু টাকা দেবো ওকে। পরে নানা ঝামেলায় আর দেয়া হয়নি। অনেক টাকা! চল্লিশটা সোনার গিনি! যাহোক কথা যখন দিয়েছি, টাকা আমি দেবোই। ও নেই তো কি হয়েছে ? তুই আছিস, তোকে দেবো। নিবি না তুই ?'

'চল্লিশ সোনার গিনি মানে তো অনেক টাকা!' ঢোক গিলে বললাম আমি। 'আপনি আবার ভেবে দেখুন, চাচা।'

'ভাবা ভাবির কিছু নেই এর ভেতর। এক মিনিটের জন্যে তুই বাইরে যা আকাশের অবস্থা কেমন একটু দেখে আয়। টাকাটা বের করে আমি ডাকবো তোকে।'

কথাটা বিশ্বাস হলো না। আকাশের অবস্থা দেখতে না ছাই, নিশ্চয়ই আমাকে বিশ্বাস করে না বলেই বাইরে যেতে বললো চাচা। যাহোক, তবু বুড়ো লোকটার ইচ্ছা অনুযায়ী চলে গেলাম বাইরে। আকাশের দিকে তাকালাম। নিকষ কালো, একটা তারা নেই। নিশ্চ-

য়ই মেঘে ছেয়ে আছে। ঝড় ঝাপটা হবে বোধহয়। কেমন যেন থম মেরে আছে প্রকৃতি।

একটু পরেই এবেনের চাচা ভেতরে ডাকলো আমাকে।

রান্নাঘরে ফিরে গেলাম আমি। গুনে গুনে সাঁইত্রিশটা সোনার গিনি দিলো ও আমার হাতে। বাকিগুলো রূপার মুদ্রা। দিতে গিয়েও কি মনে করে রূপার মোহরগুলো দিলো না আমাকে চাচা। ঢুকিয়ে রাখলো নিজের পকেটে। তারপর বললো—

'দেখলি, আমি যা বলি তা করি। নতুন মানুষের কাছে আমার আচার ব্যবহার অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনদের আমি সত্যিই সাহায্য করি।'

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হওয়ার মতো অবস্থা আমার। এই লোক সত্যিই আমাকে এতগুলো সোনার মোহর দিলো! পুরো চল্লিশটা অবশ্য দেয়নি বা দিতে পারেনি, কিন্তু সাঁইত্রিশটা তো দিয়েছে। এই বদান্যতার জন্যে আন্তরিকভাবে তাকে ধন্যবাদ জানালাম। কিন্তু মাথার ভেতর চিন্তা আমার চলছে, হঠাৎ করে কেন ও এত ভালো ব্যবহার করছে?

'না রে, ডেভি, ধন্যবাদের কিছু নেই,' বললো চাচা। 'এটা আমার কর্তব্য। তুই আমার ভাইয়ের ছেলে তাছাড়া তোকে আমি পছন্দ করি। তোকে দেবো না তো কাকে দেবো?'

এ কথা শোনার পরও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, লোকটা সত্যি কথা বলছে।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো সে।

'একটা কাজ করে দিবি, ডেভিড?' অবশেষে নীরবতা ভাঙলো চাচা। 'বাড়ির ওপ্রান্তে যে মিনারটা আছে তার ওপর থেকে একটা সিন্দুক এনে দিতে হবে। পারবি? বুড়ো হয়ে গেছি তো, গায়ে আজ-

কাল আর তেমন জোর পাই না। অবশ্য তুই না থাকলে আমাকেই আনতে হতো···।'

'নিশ্চয়ই, এনে দেবো। এক্ষুণি যাচ্ছি।'

পকেট থেকে পুরনো মরচে ধরা একটা চাবি বের করলো চাচা। আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'এটা নিয়ে চলে যা। বাইরে দিয়ে যেতে হবে তোকে। বাড়ির ওপাশটা কখনো শেষ করা হয়নি তো, তাই ভেতর দিয়ে ওঠার কোনো ব্যবস্থা নেই। যা শিগগির যা, সিন্দুকটায় কিছু জরুরি কাগজ পত্র আছে। ওগুলো এক্ষুণি দরকার আমার।'

'এই যাচ্ছি। একটা বাতি দেবেন আমাকে? কোথায় আছে বলুন, আমি ধরিয়েনিচ্ছি।'

'উঁহুঁ,' ধূর্ত একটা হাসি খেলে গেল তার ঠোঁটে। 'আমার বাড়িতে কোনো বাতি জ্বলবে না!'

'ঠিক আছে। কিন্তু, সিঁড়িটা ভালো তো?'

'ভালো মানে? চমৎকার। ওঠার সময় দেয়াল ঘেঁষে উঠিস তাহলেই হবে। রেলিং নেই সিঁড়িটায়।'

চাবিটা নিয়ে বেরিয়ে এলাম আমি নিকষ কালো আকাশের নিচে।

যা ভেবেছিলাম তাই। ঝড় আসছে। দূরে, শুনতে পাচ্ছি, শোঁ শোঁ বাতাসের গর্জন। ক্রমশ এগিয়ে আসছে। ঝড় এসে পড়ার আগেই সিন্দুকটা নিয়ে ফিরে আসার তাগিদ অনুভব করলাম মনের ভেতর। কিন্তু পারা গেল না। দেয়াল ধরে ধরে মিনারের কাছে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই মাথার ওপর চমকে উঠলো বিদ্যুৎ। মুহূর্তের জন্যে উজ্জ্বল শাদা আলোয় ঝকমকিয়ে উঠলো চারদিক। মিনারের দরজা খুললাম আমি।

ভেতরে আলোর লেশমাত্র নেই। বাইরেই নেই তো ভেতরে

আসবে কোত্থেকে? আরেকবার বিদ্যুৎ চমকাতেই সিঁড়ি দেখতে পেলাম। পর মুহূর্তে আবার সব কালো। হাতড়ে হাতড়ে সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে উঠতে শুরু করলাম এক ধাপ এক ধাপ করে।

পাঁচ তলা শ বাড়ি। সিঁড়ি ভেঙে উঠে চললাম আমি। বাতাসের গর্জন এখন কানের কাছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বৃষ্টিও এলো বলে। এবেনের চাচার কথা মতো দেয়াল ঘেঁষে উঠছি। কোনো কোনো জায়গায় দেয়াল নেই। সেই জায়গাগুলো শুধু পায়ে অনুভব করেই উঠে গেলাম। যত ওপরে উঠছি বাতাস তত নির্মল হচ্ছে। অন্ধকার ও আর আগের মতো তত গাঢ় লাগছে না। ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত মনে হলো আমার কাছে। পরের বার বিদ্যুৎ চমকাতেই বুঝতে পারলাম কারণটা। চমকে উঠলাম আমিও। বাড়ির এপাশের অন্যান্য অংশের মতো মিনারটাও অসমাপ্ত। মিনারের সিঁড়িটাও। হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেছে সিঁড়ি আর যে ধাপে এসে শেষ হয়েছে, বিদ্যুতের আলোয় দেখলাম, সে ধাপের ওপর দাঁড়িয়ে আছি আমি। মাত্র দু'-ইঞ্চি পরেই ধাপটার প্রান্ত। আর এক ধাপ উঠলেই পড়ে যেতাম নিচে অন্তত চার তলা সমান উঁচু থেকে। এই হলো আমার চাচার চমৎকার সিঁড়ির নমুনা।

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক সত্যটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠলো আমার সামনে। চারতলা সমান উঁচু অসমাপ্ত সিঁড়ি থেকে যেন পড়ে যাই সেজন্যেই চাচা আমাকে পাঠিয়েছে এখানে। মানে আমার মৃত্যুর পরিকল্পনা করেছিলো এবেনের চাচা, আমার বাবার আপন ভাই! আকস্মিক এক বিদ্যুৎচমক অপ্রত্যাশিত ভাবে বাঁচিয়ে দিয়েছে আমাকে। ভয়ে, ক্রোধে থরথর করে কাঁপতে লাগলো আমার শরীর।

ধীরে ধীরে অত্যন্ত সাবধানে নেমে এলাম। যখন মিনারের দরজায় পৌঁছুলাম প্রবল বর্ষণ শুরু হলো। দরজার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে

চাচার রান্নাঘরের দিকে তাকালাম। দেখলাম, দরজাটা খোলাই আছে। অস্পষ্ট একটু আলো এসে পড়েছে বাইরে। এই বৃষ্টির মধ্যেও কি চাচা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে? আবার বিদ্যুৎ চমকালো। হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে আছে সে। ভঙ্গিটা উৎকর্ণের মতো। গভীর মনোযোগের সাথে কিছু যেন শোনার চেষ্টা করছে। কি? আমার পড়ে যাওয়ার শব্দ শোনার জন্যে কান খাড়া করে আছে চাচা? একসেকেণ্ড পর শোনা গেল বজ্রপাতের আওয়াজ। ছুটে ভেতরে চলে গেল চাচা। ও কি বাজ পড়ার শব্দকে আমার পড়ে যাওয়ার শব্দ মনে করেছে? নাকি হত্যার প্রতিবাদে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর হয়ে দেখা দিয়েছে শব্দটা ওর মনে?

পা টিপে টিপে আমি এগোলাম রান্নাঘরের দিকে। দরজা খোলাই দেখতে পেলাম। নিঃশব্দে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে এবেনের চাচা। কাঁপছে থর থর করে। ব্র্যাণ্ডির একটা বোতল উপুড় করে দিয়েছে গলায়। পানির মতো ব্র্যাণ্ডি খাচ্ছে! বোতল ধরা হাতটাও কাঁপছে। নিঃশব্দে আরো কাছে এগিয়ে গেলাম আমি। তারপর আচমকা দু'হাতে ধরে বসলাম ওর কাঁধ।

'কি খবর!' চিৎকার করলাম ওর কানের কাছে।

আতঙ্কিত ভঙ্গিতে দু'হাত ছুঁড়ে দিলো চাচা। ছিটকে মাটিতে পড়ে চৌচির হয়ে গেল বোতলটা। ঝট করে পেছন ফিরে তাকালো আমার দিকে। পরমুহূর্তে টলে উঠলো তার শরীর। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

মরা মানুষের মতো পড়ে রইলো চাচা। বুঝতে পারছি, কিছু করা দরকার ওর জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্যে। কিন্তু, আগে নিজের জন্যে কিছু করতে হবে আমাকে। একটা বন্দুক বা ছুরি যোগাড় করতে হবে

আত্মরক্ষার জন্যে। ছুটে গেলাম আলমারিটার কাছে। কিন্তু কোনো অস্ত্র দেখলাম না তার ভেতর। তবে সিন্দুকের চাবিগুলো পেলাম। তাড়াতাড়ি চাবির গোছাটা নিয়ে ছুটে গেলাম একটা সিন্দুকের সামনে। খুললাম। ধুর-ছাই, ময়দায় ভর্তি সিন্দুকটা। আরেকটা খুললাম। টাকার থলেতে ভর্তি এটা। তৃতীয়টায় পেলাম মরচে ধরা পুরনো একটা স্কটিশ তলোয়ার। স্কটল্যাণ্ডের ওরা 'ডার্ক' বলে একে। কোটের নিচে লুকিয়ে ফেললাম তলোয়ারটা। তারপর ফিরলাম চাচার দিকে।

যেখানে ছিলো সেখানে তেমনি পড়ে আছে ও। একটা হাঁটু ভাঁজ করা, একটা হাত ছড়ানো। মুখটা নীল হয়ে গেছে। কান খাড়া করলাম, নিশ্বাসের শব্দ পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু কোনো শব্দ পাচ্ছি না। মরে গেল নাকি? ছুটে গিয়ে এক বালতি পানি এনে ঢেলে দিলাম ওর মুখে, মাথায়। কয়েক সেকেণ্ড পর চোখ মেললো চাচা। প্রথমেই দৃষ্টি পড়লো আমার ওপর। তীব্র ভয়ের ছায়া ফুটে উঠলো তার মুখে।

'বেঁচে আছিস তুই!?' স্খলিত গলায় চিঁ-চিঁ করে জিজ্ঞেস করলো চাচা।

'হ্যাঁ আছি। আর সেজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি না।'

বেশ কষ্ট করে শ্বাস নিচ্ছে ও। কোনো রকমে বললো, 'নীল বোতলটা···নীল বোতলটা···আলমারিতে।'

আলমারির কাছে ছুটে গেলাম আবার। নীল একটা ওষুধের বোতল দেখলাম সেখানে। ওটা এনে দিলাম চাচার হাতে। ভেতরের তরল পদার্থ খানিকটা খেয়ে একটু সুস্থ বোধ করতে লাগলো সে।

'আমার হৃদযন্ত্রটা, বুঝলি ডেভি,' একটা ঢোক গিলে বললো এবেনের চাচা, 'খুব···খুব দুর্বল।'

সত্যিই ভীষণ অসুস্থ দেখাচ্ছে বেচারাকে। উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলাম ওকে। তারপর আস্তে আস্তে হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলাম একটা টুলে। করুণাই বোধ করতে লাগলাম লোকটার জন্যে। তাই বলে আমার রাগ যে কমেছে তা কিন্তু নয়। আমার মনে যে প্রশ্নগুলো ভিড় করে এসেছে তীব্র ঝাঁঝের সাথে সেগুলোর জবাব চাইলাম, 'কেন বারবার মিথ্যে বলেছো আমার কাছে? কেন আমাকে এই বাড়িতে থাকতে বলেছো, আবার শর্ত-ও দিয়েছো যেন বন্ধুদের কিছু না জানাই; কেন? কেন বাবার সাথে তোমার বয়সের পার্থক্য জানাওনি? যেচে পড়ে অতগুলো মোহর কি উদ্দেশ্যে তুমি দিলে আমাকে? আর আমাকে খুন করতেই বা চেয়েছিলে কেন?'

নিঃশব্দে কিন্তু অস্থির ভাবে প্রশ্নগুলো শুনলো ও। তারপর দুর্বল কণ্ঠে মিনতি জানালো, 'এখন আমাকে ঘুমোতে যেতে দে দয়া করে। কাল সকালে সব বলবো তোকে। সত্যিই, কথা দিচ্ছি।'

বেচারাকে এমন দুর্বল আর মার খাওয়া দেখাচ্ছে যে আর কিছু বললাম না আমি। ধরে ধরে ওকে ওর ঘরে পৌঁছে দিলাম, এমন কি বিছানায় পর্যন্ত শুইয়ে দিলাম। তারপর বাইরে থেকে দরজায় তালা মেরে চাবিটা রেখে দিলাম আমার পকেটে।

রান্নাঘরে ফিরে এলাম আমি। বড় করে একটা আগুন জ্বাললাম আমার কম্বলটা নিয়ে এলাম ওপরের ঘর থেকে। তারপর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম একটা বড় বাক্সের ওপর।

পাঁচ

সারা রাত চললো ঝড়-বাদল। ভোর বেলায় থামলো বৃষ্টি। কিন্তু একটু পরেই কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে লাগলো উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে। শ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। কাছেই যে ঝরণাটা দেখেছিলাম সেখানে গিয়ে গোসল করলাম। তারপর আবার রান্না-ঘরে ফিরে বসলাম উষ্ণ আগুনের সামনে। দিলো।

বসে বসে চিন্তা করছি। একটু পরেই পরিষ্কার হয়ে গেল : এবেনের চাচা আমার শত্রু। অন্তত পক্ষে, যে কোনো কারণেই হোক, আমি তার শত্রু। তার মানে শ বাড়িতে থাকা আমার জন্যে নিরাপদ নয়। কি করবো আমি? থাকবো, না চলে যাবো?

আরো কিছুক্ষণ ভাবনা চিন্তার পর ঠিক করলাম, থাকবো আপাতত। বয়সে আমি তরুণ, আর দশটা গ্রামের ছেলের মতো শক্তিও মোটা-মুটি আছে শরীরে। তাছাড়া আমার ধারণা চাচার চেয়ে বুদ্ধিও আমার বেশি। সুতরাং শ বাড়িতে আমার অধিকার কতটুকু জানার আগে যাবো কেন?

দোতলায় উঠে এলাম আমি। চাচার ঘরের সামনে গিয়ে তালা খুললাম দরজার।

'সুপ্রভাত, ডেভি,' মার্জিত গলায় বললো এবেনের চাচা।

'সুপ্রভাত,' মৃদু হেসে জবাব দিলাম।

একটু পরেই নিচে নেমে নাশ্‌তার টেবিলে বসলাম আমরা। খাদ্য-তালিকা সেই এক, পরিজ আর বিয়ার।

খেতে শুরু করেছে চাচা। কয়েক চামচ মুখে দিয়েছে পরিজ। এই সময় আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এবার বলো, কেন আমাকে পাঠিয়েছিলে মিনারে? কেন তুমি ভয় পাও আমাকে?'

'তোর সাথে···তোর সাথে··· একটু ঠাট্টা করেছিলাম, ডেভি,' দুর্বল গলায় জবাব দিলো চাচা।

হো-হো করে হেসে উঠলাম আমি। 'এই জবাবটাও নিশ্চয়ই ঠাট্টা?'

একটু থমকালো চাচা। 'ঠিক আছে, আগে—আগে আমাকে খেয়ে নিতে দে, তারপর সব খুলে বলবো তোকে।'

মুখ দেখেই বুঝ[illegible] 'এখ[illegible]এখনো যুৎসই কোনো গল্প বানিয়ে উঠতে পারেনি, তাই একটু [illegible] ঠিক আছে, আমিও বাবা কম ত্যাঁদোড় নই, কি গল্প তুমি ফাঁদো দেখবো।

এমন সময় টোকা পড়লো দরজায়। কেউ এসেছে। চাচাকে যেখানে আছে সেখানেই থাকার ইঙ্গিত করে উঠে গিয়ে দরজা খুললাম আমি। নাবিকের পোশাক পরা রোগা এক ছেলে দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়।

'কি খবর দোস্ত্!' ভাঙা ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠলো ছেলেটা, যেন কতদিন ধরে চেনে আমাকে।

'তোমার নাম কি?' ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'নাম?' বলেই বেসুরো হেঁড়ে গলায় একটা জাহাজী গান গেয়ে উঠলো ছোকরা।

আর ভদ্রতা বজায় রাখা সম্ভব হলো না আমার পক্ষে। 'দেখ,

তোমার যদি কোনো কাজ না থাকে, কেটে পড়তে পারো এখান থেকে। আমি দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি।'

'একটু দাঁড়াও ভাই।' ব্যস্ত হয়ে উঠলো ছেলেটা। 'একটু মজা করছিলাম আর কি। যাকগে, তুমি যখন মজা পছন্দ করো না—বুড়ো হিসি-ওয়েসির কাছ থেকে আসছি আমি। মিস্টার বেলফ্লাওয়ারের জন্যে একটা চিঠি নিয়ে এসেছি।' চিঠিটা আমাকে দেখালো ও। তারপর যোগ করলো, 'দোস্ত, খাওয়ার কিছু হবে নাকি তোমাদের এখানে?'

'ভেতরে এসো, দেখি কিছু ব্যবস্থা করা যায় কিনা।'

রান্নাঘরে নিয়ে এলাম ওকে। আমার টুলটায় বসতে দিলাম। অবশিষ্ট পরিজটুকু দেখিয়ে বললাম, 'খাও।'

প্রথমে এবেনের চাচার হাতে চিঠিটা দিলো ও, তারপর ক্ষুধার্ত পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো খাবারটুকুর ওপর। নিমেষে চেটেপুটে পরিষ্কার করে ফেললো বাটি।

ইতিমধ্যে চিঠিটা পড়ে ফেলেছে চাচা। কি যেন ভাবছে এখন। হঠাৎ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার চোখ দুটো। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো টুল ছেড়ে। আমাকে টেনে নিয়ে গেল ঘরের এক কোণায়।

চিঠিটা আমার হাতে দিয়ে বললো, 'পড় এটা।'

পড়লাম আমি:

'হ-এর সরাইখানা,
'কুইনস ফেরি।

'জনাব,

'আমি আমার জাহাজ নিয়ে এখন বন্দরে আছি। আপনার যদি কোনো নির্দেশ থাকে অনুগ্রহ করে শিগগিরই জানাবেন। কারণ

বাতাস এখন খুব অনুকূল, কয়েক ঘণ্টার ভেতর জাহাজ ছাড়বো আমি।

'আপনার উকিল মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলরের সাথে আমার কিছু কথা কাটাকাটি হয়েছে। এক্ষুণি আপনার দেখা করা দরকার তার সাথে।

'আপনার একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত সেবক,

'এলিয়াস হোসিসন।'

'বুঝলি, ডেভিড,' ব্যাখ্যা করার ভঙ্গিতে শুরু করলো এবেনের চাচা, 'চমৎকার এক সওদাগরী জাহাজের ক্যাপ্টেন এই হোসিসন। আমেরিকার সঙ্গে প্রচুর ব্যবসা করে লোকটা। ওর ব্যবসায় আমার কিছু অংশীদারী আছে। এক্ষুণি যেতে হবে আমাকে, ক্যাপ্টেন হোসিসনের সাথে দেখা করতে হবে। তুই যাবি আমার সাথে কুইনস ফেরিতে? কিছু কাগজ পত্রে সই করবো, সেজন্যে হয়তো ওর জাহাজে উঠতে হবে। তারপর তোকে নিয়ে আমার উকিল মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলরের সাথে দেখা করতে যাবো। উনি তোকে সব ব্যাপার বুঝিয়ে বলবেন। আমার কথা তো তুই বিশ্বাস করবি না, ওর কথা করবি? সবাই ওঁকে খুব সম্মান করে। তোর বাবাকেও ভালো করে চিনতো, জানতো। কি বলিস, ডেভিড?'

কি বলবো কিছু বুঝতে পারছি না। তবে, কেন যেন মনে হচ্ছে, নতুন কোনো মতলব এঁটেছে চাচা। তারপরই ভাবলাম, নিশ্চয়ই অনেক লোক থাকবে হু-এর সরাইখানায়। অত লোকের ভেতর ও আমার ক্ষতি করবে কি ভাবে? উকিল মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলরের সাথেও দেখা করা দরকার। ভদ্রলোক আমার বাবা এবং আমার উত্তরাধিকার সম্পর্কে সত্যি কথা বললেও বলতে পারেন। তাছাড়া, একেবারে

কাছে থেকে সাগর আর জাহাজ দেখার শখ আমার অনেকদিনের। সুযোগ পাওয়া গেছে আজ। কেন হাতছাড়া করবো?

'ঠিক আছে,' অবশেষে বললাম আমি, 'চলুন কুইনস ফেরিতে।'

কালকের সেই নীল কোট আর হ্যাট পরে নিলো চাচা। পুরনো জং ধরা একটা তলোয়ার ঝোলালো কোমরে। আগুন নিভিয়ে বেরিয়ে এলাম আমরা বাইরে। দরজায় তালা লাগালো চাচা। তারপর রওনা হলাম নাবিক ছেলেটার সঙ্গে।

সারা রাস্তায় একটা কথা বললো না চাচা। বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছে তাকে। অতএব আমি আর কি করবো, হাঁটতে হাঁটতে আলাপ জমালাম নাবিক ছেলেটার সঙ্গে। ও বললো, ওর নাম র‍্যানসম। ক্যাপ্টেন হিসি ওয়েসির (এভাবে 'হোসিসন' নামটাকে নিজের মতো করে নিয়েছে ও) জাহাজের কেবিন বয় ও। ন'বছর বয়েস থেকে জাহাজে কাজ করে, কিন্তু এখন ওর বয়স ঠিক কত তা বলতে পারলো না। জাহাজে কাজ নেয়ার পর আর দিন তারিখের হিশেব রাখেনি।

ক্যাপ্টেন হোসিসন আর তার জাহাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম র‍্যানসমকে। জবাবে ও জানালো জাহাজটার নাম 'কভেন্যান্ট।' ওর ধারণা দুনিয়ার সেরা জাহাজ ওটা। ক্যাপ্টেন হোসিসন সম্পর্কেও দরাজ গলায় প্রশংসা করলো। বললো, 'সত্যিকারের পুরুষ মানুষ এই হিসিওয়েসি। হিংস্র, নিষ্ঠুর আর ধূর্ত।' এমন ভাবে বললো, যেন হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা, ধূর্তামি এসব খুব ভালো গুণ।

'সন্দেহ নেই ক্যাপ্টেন খুব ভালো নাবিক,' বলে চললো ও, 'তবে, মিস্টার সুহান, আমাদের মেট আরো ভালো। একটাই মাত্র দোষ তার, খুব বেশি মদ খায়। যখন ও মাতাল হয়ে যায় তখন ওর চেয়ে ভয়ঙ্কর লোক আর হয় না পৃথিবীতে। দেখ কাল আমাকে কি করেছে।' টেনে

এক পায়ের মোজা খানিকটা নামিয়ে ফেললো র‍্যানসম। ভয়ঙ্কর একটা ক্ষত দেখলাম ওর পায়ে।

'দেখেছো!' বেশ গর্বের সাথে বললো ও।

আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'ও কি মারে তোমাকে?'

'বলে কি? মারে!' হো হো করে বুনো একটা হাসি দিলো ছেলেটা। 'কেমন মারে তা তুমি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবে না!'

'তুমি মারতে দাও কেন?'

'একদিন ওকে খুন করবো, তাই সব সহ্য করে যাচ্ছি মুখ বুজে,' ফিস ফিস করে বললো ও। পোশাকের ভেতর থেকে একটা ছুরি বের করে দেখালো। 'এই ছুরি দিয়ে ওকে খুন করবো। ভেবো না ওটাই হবে আমার প্রথম খুন। আগেও করেছি।'

ছেলেটাকে পরিষ্কার পাগল মনে হলো আমার। একটু করুণাও হলো বেচারার জন্য।

'কোনো আত্মীয় বা বন্ধু নেই তোমার?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'না।'

'জাহাজের চাকরি ছেড়ে ডাঙায় কোনো কাজ নিতে পারো না?'

'মাথা খারাপ! কোন দুঃখে ছাড়তে যাবো জাহাজের চাকরি। একদিন হয়তো ওদের মতোই বড় ব্যবসায়ী হয়ে যাবো। তুমি যতটা ভাবছো এমনিতে কিন্তু তত খারাপ নয় কাজটা। তাছাড়া, যত যা-ই হোক ঐ বিশ পাউণ্ডারদের চেয়ে তো ভালো আছি।'

'বিশ পাউণ্ডার!' অবাক হলাম আমি। 'ওরা আবার কারা?'

'ক্যাপ্টেন যে সব বন্দীকে আমেরিকায় নিয়ে যায়। ক্রীতদাস হিশেবে বিক্রি করে ও ওদের। জনপ্রতি দাম নেয় বিশ পাউণ্ড। তাই

ওদের নাম হয়েছে বিশ পাউণ্ডার।'

কথাটা শুনে আতঙ্কে বাকরুদ্ধ হওয়ার অবস্থা হলো আমার।

'ক্যাপ্টেন অবশ্য,' বলে চললো র‍্যানসম, 'পিচ্চিগুলোকে পিটাতে দেয় আমাকে।'

'পিচ্চিগুলো! ওরা আবার কারা?'

'বাচ্চা, বাচ্চা।'

'বাচ্চাদেরও নেয়া হয় নাকি বিক্রি করার জন্যে!'

'নিশ্চয়ই।'

ইতিমধ্যে কখন যে পৌঁছে গেছি পাহাড়ের চূড়ায়, খেয়ালই করিনি। সেখান থেকে নিচে কুইনস ফেরির দিকে তাকালাম আমরা।

প্রায় আধ মাইল দূরে নোঙর করে থাকা একটা জাহাজের দিকে ইশারা করলো র‍্যানসম। 'ঐ যে দেখ কভেন্যাণ্ট! চিৎকার করলো ও। 'আর ঐ যে হ-এর সরাইখানা।' এবার বন্দরের পাশেই হলি আর হথর্ণ গাছে ঘেরা একটা দালান দেখালো র‍্যানসম।

চোখ ভরা আতঙ্ক নিয়ে তাকালাম জাহাজটার দিকে। অন্তরের অন্তস্তল থেকে মায়া অনুভব করলাম ওখানে আটক লোকদের জন্যে। কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে দেখলাম জাহাজটা, তারপর ফিরলাম চাচার দিকে।

'একটা কথা আগেই বলে নেয়া ভালো, এবেনের চাচা,' বললাম আমি, 'কভেন্যাণ্ট-এ কিন্তু উঠবো না আমি।'

'অ্যাঁ?' অনেক দূরে কোথাও চলে গিয়েছিলো যেন চাচার মন। আমার কথা শুনে ফিরে এলো মাটিতে।

'দুনিয়ার কোনো কিছুই আমাকে কভেন্যাণ্ট-এ ওঠাতে পারবে না,' আবার বললাম আমি।

'বেশ বেশ। তোর যা ইচ্ছে তা-ই করবি।' একটু থেমে চিন্তিত গলায় যোগ করলো, 'ছাড়বার জন্যে একেবারে তৈরি মনে হচ্ছে জাহাজটা।'

ছয়

কিছুক্ষণের ভেতর হ-এর সরাইখানায় পৌঁছে গেলাম আমরা। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলার ছোট্ট একটা ঘরে নিয়ে গেল আমাদের র‍্যানসম। সেখানে বড় একটা চুল্লির সামনে বসে আছে ক্যাপ্টেন হোসিসন। যথেষ্ট গরম কামরায়, তবু মোটা একটা কোট আর পশমী টুপি পরে আছে সে। যখন উঠে দাঁড়িয়ে চাচার সঙ্গে করমর্দন করলো তখন দেখলাম লোকটা কেমন লম্বা আর সুন্দর। মোটেই নিষ্ঠুর নয় তার চেহারা। ক্যাপ্টেনের নিষ্ঠুরতা নিয়ে র‍্যানসমের গল্পগুলোর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ হতে লাগলো আমার।

'আহ, মিস্টার ব্যালফোর, আপনি এসে পড়েছেন এত তাড়াতাড়ি। খুব খুশি হয়েছি,' বললো লোকটা। 'এখন এক ঘণ্টার ভেতর আমি পাল তুলে দিতে পারবো।'

'তোমার ঘরটা ভীষণ গরম,' জবাব দিলো চাচা।

'তা একটু গরম বটে। তবে, স্যার, আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। বছরের বেশির ভাগ সময় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকায় কাটাতে হয়

আমাকে, ঠাণ্ডা একদম সহ্য করতে পারি না।'

কাগজ পত্রে ছাওয়া একটা টেবিলের দু'পাশে বসলো দু'জন। এবার ওদের ব্যবসার আলাপ শুরু হবে।

কামরাটা এত গরম যে রীতিমতো অস্বস্তি বোধ করছি আমি। ইতিমধ্যেই ঘেমে উঠেছে শরীর। সুতরাং কয়েক সেকেণ্ড পরে চাচা যখন বললো, 'ইচ্ছে হলে বাইরে ঘুরে ফিরে আসতে পারিস,' সত্যি কথা বলতে কি বর্তে গেলাম আমি। তাজা বাতাসের বড় প্রয়োজন বোধ করছে ফুসফুসটা। সঙ্গে সঙ্গে ওদের দু'জনকে একা রেখে বেরিয়ে এলাম বাইরে। এবং এখানেই সম্ভবত জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করলাম।

হু-এর সরাইখানা থেকে বেরিয়ে বন্দরের দিকে এগোলাম আমি। জেটির ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়ালাম খানিকক্ষণ। কভেন্যাণ্ট-এর কয়েক জন নাবিককে দেখলাম, ছোট একটা নৌকায় অপেক্ষা করছে। ক্যাপ্টেন এলেই তাকে নিয়ে ফিরে যাবে জাহাজে। বিশাল একেক-জনের শরীর। রোদে পুড়ে বাদামী হয়ে গেছে গায়ের রঙ। হুবহু জল দস্যুদের মতো লাগছে দেখতে। এক জনের সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু এমন জঘন্য ভাষা তার, সরে আসতে বাধ্য হলাম ওখান থেকে। ফিরে এলাম সরাইখানায়। র‍্যানসমকে দেখলাম ওখানে। ওকে ডেকে নিয়ে এক মগ করে বিয়ার খেলাম দু'জনে।

বিয়ার এনে দিলো সরাইওয়ালা নিজে। চেহারা দেখে তাকে সৎ, ভালো মানুষ বলেই মনে হলো।

'মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলরকে চেনেন আপনি?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'কোন র‍্যাঙ্কেইলার? উকিল?'

মাথা ঝাঁকালাম আমি।

'নিশ্চয়ই চিনি। খুব ভালো লোক। তুমি তো এবেনের-এর সাথে এসেছো, না?'

'হ্যাঁ।'

'আত্মীয়?'

কি জবাব দেবো বুঝতে পারলাম না প্রথমে। একটু ইতস্তত করে বললাম, 'আঁ, না।'

'আমিও তাই আন্দাজ করেছি। যদিও ওর ভাই আলেকজাণ্ডারের সাথে বেশ মিল আছে তোমার চেহারার।'

'যতটুকু শুনেছি, এখানকার লোকেরা ভীষণ অপছন্দ করে মিস্টার এবেনেরকে। কেন বলতে পারেন?'

'করবে না। ওর মতো বদ লোক দুনিয়াতে হয় নাকি? কতো পরিবারকে যে ভিটে মাটি ছাড়া করেছে কি বলবো। এক কালে অবশ্য চমৎকার মানুষ ছিলো এবেনের। ওকে আর আলেকজাণ্ডারকে নিয়ে সেই যে গল্পটা চালু হলো তার আগের কথা সেটা।'

'কি গল্প?'

'ও নাকি আলেকজাণ্ডারকে খুন করেছে।'

'খুন করেছে! কেন?'

'কেন আবার, বাড়িটা পাওয়ার জন্যে।'

'বাড়ি পাওয়ার জন্যে!'

'নিশ্চয়ই। আর কি কারণ থাকতে পারে ভাইকে খুন করার?'

'হ্যাঁ, তাই···তাই···আর কি কারণ থাকতে পারে?···তাহলে··তাহলে আমার···মানে মিস্টার আলেকজাণ্ডার বড় দু'ভায়ের ভেতর? মানে শ বাড়ির আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী তিনিই!'

'নিশ্চয়ই,' বললো সারাইওয়ালা। তারপর অন্য এক খদ্দেরকে

পরিবেশন করার জন্যে এগিয়ে গেল। ঠিকই ভেবেছিলাম আমি! এই লোকের কথা শুনে নিশ্চিত হওয়া গেল। এ মুহূর্তে আমিই শ বাড়ির আইন সঙ্গত উত্তরাধিকারী। কি আশ্চর্য! আমি—এসেন-ডিনের সেই কিশোর পথের ভিখিরি নই মোটেই! আমার একটা বাড়ি আছে। জমি আছে। আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠলো আমার হৃদয়।

হঠাৎ জানালার দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাপ্টেন হোসিসন। কখন যে ওরা ওপর থেকে নেমে বাইরে গেছে খেয়ালই করিনি। কভেন্যান্ট-এর নৌকার সামনে দাঁড়িয়ে তার লোকদের কি যেন নির্দেশ দিচ্ছে। একটু পরে সরাইখানার সামনে এসে দাঁড়ালো লোকটা। চমৎকার সুপুরুষ একজন মানুষ। আরো একবার আমার মনে হলো কথাটা: র‍্যানসমের গল্প সত্যি হতেই পারে না।

'ডেভিড!'

গলাটা চাচার, বাইরে থেকে ডাকছে।

এক চুমুকে বাকি বিয়ারটুকু শেষ করে বেরিয়ে এলাম আমি। ক্যাপ্টেন হোসিসন-এর পাশে দাঁড়িয়ে আছে চাচা। আমাকে দেখেই অত্যন্ত নম্র, বিনয়ী একটা ভঙ্গি হলো ক্যাপ্টেনের মুখে।

'মিস্টার ব্যালফোর খুব প্রশংসা করলেন তোমার,' চাচার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে সে বললো। 'আর আমার কথা যদি বলো, তোমাকে দেখেই পছন্দ করে ফেলেছি। একটু বেশি সময় তোমার সাথে কাটাতে পারলে খুব ভালো লাগতো, কিন্তু কি করবো বলো, এক ঘণ্টার ভেতর জাহাজ ছাড়তেই হবে। এই সময়টুকু আমরা একসাথে থাকতে পারি, কি বলো? চলো আমার জাহাজে, এক গ্লাস বিয়ার খাবে আমার সাথে।'

সন্দেহ নেই কভেন্যান্ট-এর ভেতরটা দেখার খুবই আগ্রহ হচ্ছে আমার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে হচ্ছে, চাচার কোনো কৌশল নয়তো এটা?

'অনেক ধন্যবাদ স্যার,' একটু ভেবে শান্ত গলায় জবাব দিলাম আমি। 'আপনার জাহাজে উঠতে পারলে খুব ভালো লাগতো, কিন্তু অন্য জায়গায় একটু কাজ আছে আমার। চাচার সাথে ওর উকিল মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলরের সাথে দেখা করতে যাবো।'

'জানি, তোমার চাচা বলেছে সে কথা। আধ ঘণ্টার বেশি থাকতে হবে না তোমাকে। আধ ঘণ্টা পর আমার লোকরা···না আমি নিজে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবো মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলরের বাড়িতে।' হঠাৎ আমার কাঁধ ধরে হাঁটতে শুরু করলো হোসিসন। কানের কাছে মুখ এনে বললো, 'ডেভিড, তোমার চাচা হলো একটা বুড়ো শেয়াল। আমার সঙ্গে চলো, তোমাকে বলবো, কি ফন্দি এঁটেছে বদমাশটা।' পরমুহূর্তে আবার জোরে জোরে বললো, 'তাহলে বলো, তোমার জন্যে কি আনবো আমেরিকা থেকে? ভালুকের চামড়া হলে চলবে? নয়তো ইণ্ডিয়ান পাইপ অথবা তোতা পাখি? নাকি রক্তের মতো লাল কার্ডিন্যাল পাখি চাও? যেটা যেটা পছন্দ তোমার বলো।'

ইতিমধ্যে কভেন্যান্ট এর সেই ছোট্ট নৌকাটার কাছে পৌঁছে গেছি আমরা। আবার অনুরোধ জানালো আমাকে ক্যাপ্টেন। আগ-পাছ ভালো করে ভেবে দেখলাম। মনে হলো সত্যিকারের একটা বন্ধু পেয়েছি (উহু, কি গর্দভ আমি!) চাচার নতুন ফন্দি সম্পর্কে জানা যাবে, তাছাড়া জাহাজটাও দেখা হবে।

'ঠিক আছে চলুন,' অবশেষে বললাম।

উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ক্যাপ্টেনের মুখ চোখ।

'সত্যিই যাবে তুমি! চলো তাহলে নৌকায় ওঠা যাক।'

প্রথমে উঠলো হোসিসন, তারপর আমি। এমন সময় দেখি, ছুটতে ছুটতে আসছে চাচা।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'আমিও যাবো,'।

মনে মনে একটু হতাশ হলাম আমি—চাচার নতুন ফন্দিটা বোধ-হয় ঘানা হলো না। যাহোক মুখে কিছু বললাম না। নৌকায় উঠে বসলো চাচা। দাঁড় টানা শুরু করলো খালাসীরা।

কিছুক্ষণের ভেতর কভেন্যান্ট-এর বেশ কাছাকাছি চলে গেলাম আমরা। ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে জাহাজটার অবয়ব। পেছন দিয়ে ঘুরে জাহজের পাশে নিয়ে গেল খালাসীরা নৌকাটাকে। চোখ বড় বড় হয়ে গেল আমার : কি উঁচু ডেক!

'তুমি আজ আমাদের বিশেষ অতিথি,' বললো ক্যাপ্টেন হোসিসন, তুমিই প্রথম উঠবে জাহাজে। এই, একটা রশি নামিয়ে দাও কেউ!'

ধীরে ধীরে জাহাজের গায়ে গিয়ে ভিড়লো নৌকা। কয়েকজন নাবিক মোটা একটা দড়ি নামিয়ে দিলো ওপর থেকে। রশিটা শক্ত করে ধরলাম আমি। টেনে তুললো খালাসীরা। আমি জাহাজে পা রাখার কয়েক সেকেণ্ডের ভেতর দেখলাম রশি ছাড়াই উঠে এসেছে ক্যাপ্টেন হোসিসন। অনেক দিনের পুরনো বন্ধুর মতো আমার হাত তুলে নিলো ক্যাপ্টেন নিজের হাতে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ। আমাকে জাহাজের দুলুনির সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে নিতে দিলো। তার-পর দেখাতে শুরু করলো জাহাজের বিভিন্ন অংশ। ব্যাখ্যা করে বোঝালো কোনটার কি নাম এবং কি কাজে লাগে।

মুগ্ধ হয়ে দেখছি আমি। হঠাৎ খেয়াল হলো, চাচাকে তো উঠতে

দেখলাম না। ব্যাপার কি?

'চাচা কোথায়?' উদ্বেগের সাথে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'তাই তো! গেল কোথায় তোমার চাচা!' মিটি মিটি হাসি হোসি-সনের মুখে, চোখে ক্রূর দৃষ্টি।

ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিলাম আমি ওর হাত থেকে। ছুটে গেলাম জাহাজের কিনারে। ছোট্ট নৌকাটা এগিয়ে চলেছে তীরের দিকে। এবং চাচা বসে আছে তাতে। ঝট করে ফিরলাম ক্যাপ্টেনের দিকে। মিটি মিটি হাসিটা ক্রমে শয়তানী হাসিতে পরিণত হচ্ছে।

'বাঁচাও!' চিৎকার করলাম আমি। 'কে আছো, বাঁচাও! আমাকে খুন করবে!'

চাচা শুনতে পেলো আমার চিৎকার। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। দূর থেকেও স্পষ্ট দেখতে পেলাম, ওর মুখের হাসিটা ক্যাপ্টেনের মতোই শয়তানীতে ভরা। আর কিছু দেখার সুযোগ হলো না। কেউ এক-জন প্রচণ্ড এক ঘুসি লাগালো আমার মাথায়, জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম আমি।

সাত

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এলো আমার। সংজ্ঞাহীনতার আঁধার থেকে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু কোনো আলো দেখতে পাচ্ছি না কোথাও। অন্ধকার থেকে আবার অন্ধকারে। সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। প্রথম কিছুক্ষণ ভেবে পেলাম না, কোথায় আছি। ঢেউয়ের গর্জন শুনতে পাচ্ছি। পালে বাতাস বাধার আওয়াজ কানে আসছে। নাবিকদের চিৎকার, মুখঝিস্তি। জাহাজের দুলুনি-ও অনুভব করছি শরীরের নিচে। কিন্তু গুছিয়ে ভাবতে পারছি না কিছুই। ভয়ানক দুর্বল লাগছে।

অনেকক্ষণ পর একটু একটু করে বুঝতে শুরু করলাম। কোনো জাহাজের খোলে শুইয়ে রাখা হয়েছে আমাকে। নিশ্চয়ই জাহাজটা কভেন্যান্ট। শক্ত করে বাঁধা হাত-পা। নাড়ার কোনো উপায় নেই। আমি কি বন্দী? নিঃসন্দেহে। তা না হলে এমন করে হাত-পা বাঁধা থাকবে কেন? তার মানে আরো একবার আমি হেরে গেলাম এবেনের চাচার শয়তানী বুদ্ধির কাছে। কি লজ্জা! ছি! ওহ, সেই ব্যথা!

কতক্ষণ এভাবে পড়ে আছি জানি না। দিন রাত সব সমান। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নেই চারপাশে। না, ভুল বললাম,

আরেকটা জিনিস আছে। ব্যথা। অন্ধকার যেমন একমুহূর্তের জন্যেও ফিকে হয়নি, সারা শরীরের প্রচণ্ড ব্যথাও তেমনি বারেকের জন্যেও রেহাই দেয়নি আমাকে। কিছুক্ষণ ব্যথা সহ্য করার পর আপনা থেকেই ঢিলে হয়ে গেছে শরীর। ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছি। ভয়ানক সব দুঃস্বপ্ন। জেগে গেছি আবার।

যেখানে আমাকে ফেলে রাখা হয়েছে সেখানকার বাতাস গুমোট পুঁতিগন্ধময়। ইঁদুরের দৌরাত্ম্য! ওহ! আমার গায়ের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যাচ্ছে ইঁদুর। এমন কি মুখের ওপর দিয়ে-ও! কিন্তু কিছুই করার নেই আমার।

অবশেষে আলোর মুখ দেখলাম। কেউ একজন বাতি উঁচু করে ধরেছে আমার মুখের ওপর। দীর্ঘ অন্ধকারের পর আলো, সইলো না চোখে। ভুরু কুঁচকে চোখ বন্ধ করে ফেললাম আমি। একটু পরে ধীরে ধীরে খুললাম আবার। ছোটখাটো একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। সবুজ চোখ, সুন্দর করে ছাঁটা একমাথা চুল। বছর তিরিশেক বয়েস লোকটার। তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

'বেশ,' বললো সে, 'কি অবস্থা?'

মুখ খুললাম জবাব দেয়ার জন্যে, কিন্তু স্বর বেরোলো না গলা দিয়ে। গোঙানির মতো একটা আওয়াজ হলো শুধু।

এবার হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো লোকটা আমার পাশে। নাড়ী দেখলো, মাথার পাশে ক্ষতটা পরীক্ষা করলো। তারপর পরিষ্কার করে পট্টি বেঁধে দিতে লাগলো।

'ভাগ্য ভালো তোমার, আরো মারাত্মক হতে পারতো জখমটা,' বললো সে, গলায় সহানুভূতির সুর। 'যাকগে, যা হবার হয়েছে, মনে ফূর্তি আনো তো দেখি। খাওয়া দাওয়া কিছু হয়েছে?'

ভালো প্রশ্ন করেছে যা হোক। জান বাঁচে না তো খাওয়া।

'না না, এখন কিছু খেতে পারবো না আমি.' দুর্বল গলায় জবাব দিলাম। সত্যিই, মনে হচ্ছে, এখন কিছু খেতে গেলে বমি করে ফেলবো। জ্বর জ্বর লাগছে শরীরে।

খানিকটা ব্র্যাণ্ডি আর পানি খাইয়ে দিলো লোকটা আমাকে। তারপর চলে গেল। আমার হাত পায়ের বাঁধন তেমনই রইলো।

একটু পরেই আবার এলো লোকটা। এবার ক্যাপ্টেন রয়েছে তার সাথে। আবার সে আমার মাথার ক্ষতটা পরিষ্কার করলো বসে বসে। নিঃশব্দে দেখলো হোসিসন।

'দেখুন,' হাতের কাজ শেষ করে লোকটা বললো, 'কি অবস্থা বেচারার। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, এই ক'দিনে কোনো খাবার দেয়া হয়নি, আলোর ব্যবস্থা করা হয়নি···।'

'তারপর ?'

'এক্ষুণি ওকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া দরকার। আপনি অনুমতি দিলে ফোরক্যাস্‌লেই রাখতে পারবো আমরা ওকে।'

'না, মিস্টার রিয়াক, ও এখানেই থাকবে,' শীতল গলায় বললো ক্যাপ্টেন।

'এখানে থাকলে তো মরে যাবে !'

'পাগল না মাথা খারাপ ! নাকি এর ভেতরই বেশ খানিকটা মাল টেনে ফেলেছো ?' বলতে বলতে রওনা হলো ক্যাপ্টেন। এক লাফে এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরলো ছোটখাটো লোকটা।

'ছেলেটাকে খুন করার জন্যে পয়সা দেয়া হয়েছে নাকি আপনাকে ?'

'খুন ! কে বললো খুন ?' চিৎকার করলো ক্যাপ্টেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, 'বেশ, রিয়াক, তোমার ইচ্ছেই

তাহলে বহাল থাক। নিয়ে যাও ছোকরাকে ফোরক্যাস্‌ল-এ।'

আমার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিলো রিয়াক। উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলো। দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরে উঠলো আমার। টলমল করে উঠলো পা। রিয়াক তাড়াতাড়ি দু'হাত বাড়িয়ে ধরলো আমাকে। ধীরে ধীরে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল ফোরক্যাস্‌ল পর্যন্ত। এক নাবিক মই বেয়ে ফোরক্যাস্‌ল-এ নামতে সাহায্য করলো আমাকে। তারপর রিয়াক আর নাবিকরা ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলো একটা বাঙ্ক-এ। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারালাম আবার।

যখন জ্ঞান ফিরলো, দেখলাম, বিরাট একটা কামরায় শুয়ে আছি আমি। আলো আছে কামরাটায়। আছে তাজা বাতাস। কয়েকজন নাবিক তাদের বাঙ্কে শুয়ে আছে। দু-একজন ধূমপান করছে। বাকিরা ঘুমাচ্ছে নয় তো বিশ্রাম নিচ্ছে। আমাকে নড়াচড়া করতে দেখেই ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এলো এক নাবিক। একটা পাত্রে খানিকটা তরল পদার্থ এগিয়ে দিলো।

'খেয়ে নাও,' বললো নাবিকটা। 'মিস্টার রিয়াকের নির্দেশ। শিগগিরই ভালো হয়ে যাবে এটা খেলে।'

বিনা বাক্যব্যয়ে তরল পদার্থটুকু গলাধঃকরণ করলাম আমি। তারপর শুয়ে রইলাম চুপচাপ।

বেশ কয়েক দিন শুয়ে শুয়ে কাটালাম আমি এই ফোরক্যাস্‌ল-এ। স্বেচ্ছায় নয়। বাধ্য করা হলো আমাকে। এই ক'দিন একটু একটু করে বুঝতে পারলাম আমার বর্তমান সঙ্গী অর্থাৎ নাবিকের স্বরূপ। লোকগুলোকে খারাপ বললে কম বলা হয়। রুক্ষ স্বভাব। চরিত্রের দিক থেকে যেমন বদমাশ, তেমনি পাজি। মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলোর একটাও যদি উপস্থিত থাকে তাদের ভেতর। মুখখিস্তি ছাড়া

কেউ কখনো কথা বলে না। তবে আশ্চর্য একটা সরল সততাও আছে তাদের ভেতর। অন্তত আমার সঙ্গে দেখিয়েছে এই সততাটুকু। কখনো খারাপ ব্যবহার তো করেইনি বরং ক্যাপ্টেন যখন চাচার দেয়া মোহরগুলো আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ভাগ করে দিলো ওদের ভেতর, ওরা, আবার সেগুলো ফেরত দিয়ে দিলো আমাকে।

ভীষণ খুশি হলাম আমি ব্যাপারটায়। অভিভূত হয়ে গেলাম রীতিমতো। আমেরিকায় পৌঁছানোর পর কাজে লাগবে মোহরগুলো। অবশ্য খুব একটা আশাবাদী হতে পারছি না, কারণ আমেরিকায় পৌঁছে শুধু শুধু ছেড়ে দেবে না আমাকে হোসিসন। পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করার চেষ্টা করবে কোনো আখ বা তুলা খামারে। আশার কথা একটাই, শুনেছি আমেরিকায় নাকি শাদা মানুষ কেনা বেচা নিষিদ্ধ করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করার পর। সুতরাং আমাকে আমেরিকায় পৌঁছে দেয়ার জন্যে যে টাকা দিয়েছে এবেনের চাচা তার অতিরিক্ত কিছু না-ও জুটতে পারে হোসিসনের কপালে।

র‍্যানসম মাঝে মাঝে আসে। ওর কাজ আসলে জাহাজের কর্মকর্তারা যেখানে থাকে সেই রাউণ্ড হাউসে। অবসর সময়ে গল্প গুজব করতে আসে ফোরক্যাস্‌ল-এ। এবং প্রতিবারই মিস্টার শুহানের নিষ্ঠুরতা নিয়ে নতুন নতুন গল্প শোনায়। প্রতিদিন-ই দেখানোর মতো নতুন ক্ষত থাকে তার শরীরের কোথাও না কোথাও। মাঝে মাঝে একেবারে মাতাল হয়ে আসে ও। সেটা অবশ্য জাহাজের দ্বিতীয় মেট মিস্টার রিয়াকের কল্যাণেই সম্ভব হয়। দয়া পরশ হয়ে ছেলেটাকে ব্র্যাণ্ডি দেয় সে। মাতাল অবস্থায় উদ্দাম নাচ নাচে র‍্যানসম। সেই সাথে গান। আহ্, সে গানের কি ছিরি! এসব দেখে খালাসীরা খুব মজা পায়। হাসে প্রাণ খুলে। তরঙ্গসঙ্কুল সাগরের নিস্তরঙ্গ জীবনে এটাই

যেন ওদের একমাত্র বিনোদন। কিন্তু র‍্যানসমের এই উদ্ভট নাচ আর নাবিকদের পৈশাচিক হাসি দেখে কান্না পেয়ে যায় আমার।

এক বা দু'দিন পর পরই ছোট খাটো ঝড়ের কবলে পড়ে কভে-ন্যান্ট। সে সময় ভীষণ বেড়ে যায় খালাসীদের কাজের চাপ। সবাই-কে তখন ডেকে থাকতে হয়। ঘণ্টায় ঘণ্টায়, কখনো বা মিনিটে মিনিটে পাল উঠাতে নামাতে হয়; দড়ি দড়ার বাঁধন আলগা বা শক্ত করতে হয়। মোট কথা কাজের কামাই থাকে না নাবিকদের। ঝড় কমলে ফোর-ক্যাস্‌ল-এ ফিরে আসে ওরা। তখন প্রত্যেকের-ই মেজাজ থাকে খিঁচড়ে। নিজেদের ভেতর ঝগড়া-ঝাটি শুরু হয়ে যায়। হাতাহাতি-ও হয় কখনো কখনো। অন্তর থেকে আমি ঘৃণা করি ওদের এই ঝগড়া, মারামারি। কিন্তু কিছু করতে পারি না। একটা কথা পর্যন্ত বলতে পারি না। আমি তো বন্দী এখানে। কি করার আছে আমার?

আট

এক রাতে, তখন প্রায় এগারোটা বাজে, ডেকে পাহারায় ছিলো যে নাবিকরা তাদের একজন এলো ফোর ক্যাস্‌ল-এ। বললো, কোট নিতে এসেছে, বাইরে নাকি খুব ঠাণ্ডা। কোট নেয়াটা যে ছুতো তা বুঝতে পারলাম একটু পরেই। কোট নিয়ে যাওয়ার সময় সে ফিস ফিস করে অন্য এক নাবিককে বলে গেল, 'ছোঁড়াকে শেষ করে দিয়েছে শুহান!'

ছোঁড়া বলতে নাবিটা কাকে বোঝালো তা বোঝতে বাকি রইলো না কারো। শিউরে উঠলাম আমি। ফিসফিসানি ছড়িয়ে পড়লো সারা ফোরক্যাসল-এ। কয়েক মিনিটের ভেতর সবাই জেনে গেল ব্যাপারটা : শুহান খুন করেছে হতভাগ্য র‍্যানসমকে!

নাবিকটা চলে যাওয়ার একটু পরেই ক্যাপ্টেন হোসিসন এলো ফোরক্যাস্‌ল-এ। লণ্ঠনের মৃদু আলোয় তীক্ষ্ণ চোখে পরীক্ষা করলো প্রতিটা খালাসির মুখ। অবশেষে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো।

'কি খবর, ডেভিড?' আশ্চর্য কোমল, শান্ত গলায় বললো সে। 'তোমাকে তো রাউণ্ড-হাউসে দরকার আমাদের, ওখানে কাজ করবে তুমি।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালাম আমি ক্যাপ্টেনের মুখের দিকে। কিছু বলতে পারলাম না।

'তুমি র‍্যানসমের বাঙ্কে চলে যাও,' আবার বললো হোসিসন, 'ও চলে আসবে তোমারটায়। তাড়াতাড়ি!'

ব্যাপারটা এমন অপ্রত্যাশিত যে এবার-ও কোনো কথা বলতে পারলাম না আমি। হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে আছি আমার বাঙ্কের পাশে। এমন সময় দু'জন নাবিক ধরাধরি করে নিয়ে এলো র‍্যানসমের নিস্পন্দ দেহ। লণ্ঠনের মৃদু আলো পড়লো ছেলেটার মুখে। উহ! সে দৃশ্য ভোলার নয়! মোমের মতো শাদা হয়ে গেছে মুখটা। ভয়ঙ্কর এক হাসিতে বেঁকে আছে ঠোঁট। দেখে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে চাইলো আমার। আতঙ্কিত ভঙ্গিতে ঢোক গিললাম একবার।

'কই, ডেভিড, গেলে না?' চিৎকার করলো ক্যাপ্টেন। এবার আর তেমন কোমল নয় তার গলা।

ছুটলাম আমি। মই বেয়ে উঠে এলাম ডেকে। তারপর আবার দৌড়ালাম রাউণ্ড-হাউসের দিকে।

ডেকের ছ'ফুট ওপরে রাউণ্ড-হাউস। বেশ বড় একটা কামরা। ভেতরে আসবাবপত্রের মধ্যে একটা টেবিল, একটা বেঞ্চ আর দুটো বাঙ্ক। একটা বাঙ্ক ক্যাপ্টেনের জন্যে, অন্যটা দুই মেটের। ঘরটার চারদিকে একের পর এক সাজানো বড় বড় আলমারি। সবগুলো তালা মারা। খাবার-দাবার থেকে শুরু করে বন্দুক, গুলি-বারুদ পর্যন্ত জাহাজের যাবতীয় জিনিসপত্র রাখা হয় ওগুলোতে। দেয়ালের এক জায়গায় দেখলাম কয়েকটা তলোয়ার ঝুলছে। দু'পাশে ছোট ছোট দুটো জানালা আর ছাদের ওপর কাচ লাগানো একটা ফোকর দিয়ে দিনের বেলায় আলো আসে এঘরে। রাতে লণ্ঠন জ্বালানো হয় অন্ধ-

কার দূর করার জন্যে।

ঢুকলাম আমি রাউণ্ড-হাউসে। মিস্টার শুহান বসে আছে টেবিলের সামনে। লণ্ঠনের আলোয় চকচক করছে তার মুখ। সামনে এক বোতল ব্র্যাণ্ডি আর টিনের একটা মগ। দীর্ঘদেহী লোক মিস্টার শুহান। পেটা শরীর। কুচকুচে কালো চুল মাথায়। উজবুকের ভঙ্গিতে টেবিলের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

আমি যে ঘরে ঢুকেছি তা খেয়ালই করলো না লোকটা। একটু পরে যখন ক্যাপ্টেন এলো এবং আমার পাশে বাঙ্কের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো তখনও তার কোনো ভাবান্তর হলো না। আরো কিছুক্ষণ পর এলো রিয়াক। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলো একবার। সে দৃষ্টির অর্থ ধরতে অসুবিধা হলো না আমার। আর কোনো সন্দেহ নেই, মারা গেছে ছেলেটা।

তিনজনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম খুনী লোকটাকে। এখনো সে তেমনি তাকিয়ে আছে টেবিলের দিকে। পাগল নাকি?

আচমকা হাত বাড়ালো মিস্টার শুহান ব্র্যাণ্ডির বোতলটা নেয়ার জন্যে। এক লাফে এগিয়ে গেল রিয়াক। ওর হাত থেকে বোতলটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিলো সাগরে।

ভয়ঙ্কর এক চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলো শুহান। ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি রিয়াকের ওপর। প্রয়োজন হলে আরো একটা খুন করবে এমন ভঙ্গি মুখে। কিন্তু সুযোগ পেলো না সে। ক্যাপ্টেন এগিয়ে এসে দাঁড়ালো দু'জনের মাঝখানে।

'হয়েছে, এবার থামো! মাতাল, পশু কোথাকার! কি করেছো, জানো? ছেলেটাকে খুন করেছো তুমি!'

কোনো কথা না বলে বসে পড়লো শুহান। হাত তুলে কপাল

চেপে ধরলো।

'ও আমাকে নোংরা মগ এনে দিয়েছিলো,' দুর্বল গলায় বললো সে।

ক্যাপ্টেন, মিস্টার রিয়াক আর আমি একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলাম। বলে কি লোকটা! নির্ঘাত পাগল হয়ে গেছে। তা না হলে নোংরা মগ এনে দিয়েছিলো বলে খুন করে ফেলতে পারে একটা ছেলেকে! ক্যাপ্টেন এগিয়ে গেল তার কাছে। আলতো করে ধরলো একটা বাহু। টেনে নিয়ে গেল বাঙ্কের কাছে। তারপর শান্ত স্বরে বললো, 'যাও, শুহান, শুয়ে পড়ো।'

বাধ্য ছেলের মতো নির্দেশ পালন করলো মেট।

এরপর দ্বিতীয় মেটের দিকে ফিরলো হোসিসন।

'মিস্টার রিয়াক,' বললো সে, 'কেউ যেন জানতে না পারে এ কথা। বলবে, ওপর থেকে পড়ে ঐ দশা হয়েছে ছোকরার। আমিও সমর্থন করবো তোমার কথা।' টেবিলের দিকে তাকালো ক্যাপ্টেন। 'বোতলটা ফেলে দিলে কেন, অ্যাঁ? পয়সা লাগেনি কিনতে?' আমার দিকে ফিরে যোগ করলো, 'যাও, আরেকটা বোতল নিয়ে এসো, ডেভিড! ঐ যে, ঐ আলমারির নিচের তাকে আছে।'

নিঃশব্দে এগিয়ে গেলাম আমি। একটা বোতল বের করে এনে রাখলাম টেবিলে। দুটো গেলাস এনে দিলাম। ক্যাপ্টেন আর তার দ্বিতীয় মেট বসে গেল মদ খেতে।

রাউণ্ড-হাউসে কাজের প্রথম রাতটা কেটে গেল এভাবে। শিগগিরই আমি অভ্যস্ত হয়ে গেলাম কেবিন-বয়ের কাজে। আসলে কঠিন কিছু না। খাওয়ার সময় খাবার পরিবেশন করা, এঁটো বাসনপত্র সরিয়ে নেয়া, মাঝে মাঝে ক্যাপ্টেন বা মেটদের টুকটাক ফাই ফরমাস খাটা।

বসে। রাতে রাউণ্ড-হাউসের শেষ প্রান্তে মেঝেতে একটা কম্বল পেতে শুয়ে পড়ি। একে বিছানা ঠাণ্ডা আর শক্ত তার ওপর কিছুক্ষণ পরপরই ক্যাপ্টেন বা মেটদের কেউ ডেকে যাচ্ছে, আসছে এবং এসেই হয়তো ফরমাস দিচ্ছে, 'একটা বোতল নিয়ে এসো, ডেভিড,' অথবা, 'গেলাস নিয়ে এসো'। মোট কথা রাতে খুব একটা আরামে ঘুমাতে পারি না।

কাজ করতে করতে প্রায়ই বাসন পেয়ালা ভাংছি—অবশ্যই ইচ্ছে করে নয়, জাহাজের দুলুনিই এর মূল কারণ। কিন্তু ক্যাপ্টেন বা রিয়াক কিছু বলে না আমাকে। এমন কি মুখে পর্যন্ত কিছু বলে না, হয়তো ভুরু কুঁচকে একটু তাকালো, হয়ে গেল শাসন। বোধহয় র‍্যানসমের দুর্ভাগ্যের কথা মনে আছে ওদের। এখন যদি আমার কপালেও অমন কিছু ঘটে তাহলে আমার চেয়ে ওদের অসুবিধাই হবে বেশি তা সম্ভবত বোঝে।

শুহানের কি মনে আছে র‍্যানসমের কথা? আমার ধারণা, অবশ্যই আছে। মদের ঘোরে কি করেছিলো তা হয়তো এখন আর মনে নেই, কিন্তু আমার দিকে তাকানোর ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারি, র‍্যানসমের কথা মনে আছে ওর।

একদিন অনেকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ও আমার দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি নতুন এসেছো, তাই না?'

'জি, স্যার।'

'তোমার আগে আরেকটা ছেলে কাজ করতো এখানে, তাই না?'

'জি, স্যার।'

'হা! আমিও তাই ভেবেছিলাম। যাও-আমার জন্যে এক বোতল ব্র্যাণ্ডি নিয়ে এসো।'

নয়

এক হপ্তার-ও বেশি কেটে গেছে তারপর। আবহাওয়া ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। গত কয়েক দিনে খুব সামান্যই এগিয়েছে কভেন্যান্ট। আজ এগোনো তো দূরের কথা ঝড়ের দাপটে সত্যি কথা বলতে কি পিছিয়ে যাচ্ছি আমরা। নির্দিষ্ট গতিপথ থেকে অনেকখানি সরে এসেছে জাহাজ।

নবম দিনে উত্তর পশ্চিম স্কটল্যাণ্ডের পাহাড়ী উপকূলে নিয়ে গেল ঝড় কভেন্যান্টকে। বাতাসের বেগ আরো বেড়েছে। নাবিকরা জাহাজ সামলাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। যে কোনো মুহূর্তে জাহাজ পাহাড়ী উপকূলে গিয়ে আছড়ে পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বিধ্বস্ত হবে কভেন্যান্ট। আর তা-ই যদি হয়, ক'জন বাঁচবে ক'জন মরবে কেউ বলতে পারে না। মোট কথা ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন আমরা।

দশম দিনে মোটামুটি শান্ত হয়ে এলো সাগর। কিন্তু ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল চারদিক। এতে বিপদের মাত্রা আরো বাড়লো। সামান্য দূরের জিনিস-ও এখন আর দেখতে পাচ্ছি না।

সেদিন বেশ রাতে ক্যাপ্টেন আর মিস্টার রিয়াককে আমি রাতের খাবার পরিবেশন করছি। হঠাৎ কিছু একটার সঙ্গে সশব্দে বাড়ি

খেলো জাহাজ। তারপরই অস্পষ্ট কতগুলো চিৎকার। লাফিয়ে উঠলো ক্যাপ্টেন আর দ্বিতীয় মেট।

'নিশ্চয়ই কোনো ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়েছে জাহাজ!' চিৎকার করলো মিস্টার রিয়াক।

'জি না, জনাব,' বিদ্রূপের ভঙ্গি ক্যাপ্টেনের গলায়, 'এই মাত্র একটা নৌকার বারোটা বাজালাম আমরা।'

দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল দু'জন রাউণ্ড-হাউস থেকে।

ক্যাপ্টেনের কথাই ঠিক। ঘন কুয়াশায় সামনে কিছু দেখতে পায়নি পাহারাদার—অবশ্য কুয়াশা না থাকলেও যে দেখতে পেতো তা নিশ্চিত করে বলার কোনো উপায় নেই। নৌকায় বাতি না থাকলে এমনিতেই রাতের অন্ধকারে ওটার ওপর উঠে পড়ার আশঙ্কা ছিলো কভেন্যান্ট-এর। যাহোক, পাহারাদার কিছু দেখতে পায়নি বলে সর্তক-ও করতে পারেনি হালের লোকটাকে। ফলে যা হবার তা-ই হয়েছে। নৌকাটা ছিলো জাহাজের গতিপথে। সোজা গিয়ে ওটাকে আঘাত করেছে কভেন্যান্ট।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে-চুরে ডুবে গেছে নৌকাটা। একজন ছাড়া আরোহীরাও সবাই ডুবে গেছে। যে লোকটা বেঁচেছে সে নৌকার পেছন দিকে বসেছিলো। ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পানিতে পড়ে যায় সে। ভাগ্য ভালো লোকটার, পানিতে পড়ার মুহূর্তে তার হাত পড়ে কভেন্যান্ট-এর সামনের প্রান্ত থেকে বেরিয়ে থাকা বাঁকা কাঠটায়। সঙ্গে সঙ্গে সে আঁকড়ে ধরে সেটা, এবং কোনোমতে বেয়ে উঠে আসে ডেকে। তার সাহস আর ভাগ্য দেখে অবাক না হয়ে পারলাম না আমি।

একটু পরে ক্যাপ্টেন এবং মেটের সাথে রাউণ্ড-হাউসে এলো

লোকটা। শান্ত নিরুদ্বেগ চেহারা। উত্তেজনার কোনো ছাপ নেই মুখে।

ছোটখাটো শরীর তার, তবে চমৎকার গঠন। যেখানে যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই আছে মাংস, একটুও কম বা বেশি নয়। অত্যন্ত দ্রুত তার চলা ফেরা, নড়াচড়া। মুখটা নিষ্পাপ, সরল কিন্তু চোখ দুটো জ্বলজ্বলে, এবং বুনো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাতে। আচার আচরণে নিখুঁত ভদ্রলোক। যখন ভেজা কোটটা খুলে ফেলে এক জোড়া চমৎকার রূপোর কাজ করা পিস্তল রাখলো টেবিলে তখন দেখলাম লম্বা একটা তলোয়ার ঝুলছে তার কোমরবন্ধ থেকে। শেষ পর্যন্ত লোকটা আমার শত্রু হবে না বন্ধু? নিজেকেই করলাম আমি প্রশ্নটা।

আরো কিছুক্ষণ দেখলাম তাকে। তারপর আপন মনে বললাম, 'জানি না শেষ পর্যন্ত কি হবে। তবে ওকে বন্ধু হিসেবে কল্পনা করতেই ভালো লাগছে আমার।'

'আমি যখন আগন্তুককে পর্যবেক্ষণ করছি ক্যাপ্টেন হোসিসন তখন তীক্ষ্ণচোখে পরীক্ষা করছে তার কাপড়চোপড়। বেশ দামী আর উঁচু মানের জিনিস সেগুলো। পালক লাগানো একটা হ্যাট লোকটার মাথায়, পরনে লাল ওয়েস্টকোট, কালো মখমলের ব্রিচেস এবং রূপার বোতাম লাগানো নীল কোট।

'আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি, স্যার,' বললো ক্যাপ্টেন, 'নৌকাটার ব্যাপারে ...।'

'দুঃখ প্রকাশ করলে আর কি হবে?' বললো আগন্তুক। 'লোকগুলোকে তো আর ফেরত পাওয়া যাবে না। ওহ, বড় ভালো মানুষ ছিলো ওরা!'

'আপনার বন্ধু?' হোসিসনের প্রশ্ন।

'বন্ধু! বন্ধুর চেয়েও বেশি। আমার জন্যে প্রাণ দিতেও দ্বিধা করতো না ওরা!'

'আবার-ও দুঃখ প্রকাশ করছি আমি। সত্যিই বলছি, ব্যাপারটায় আমাদের কোনো হাত ছিলো না। নিছক দুর্ঘটনা। তাছাড়া আমার ধারণা অমন লোক আরো অনেক যোগাড় করতে পারবেন আপনি।'

'হুঁ। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?'

আমি অনেক দিন ফ্রান্সে কাটিয়েছি, স্যার,' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকালো ক্যাপ্টেন।

'সুতরাং ওরকম অনেক লোক আছে আপনার।' ঝাঁঝ আগন্তুকের কণ্ঠস্বরে।

'নিঃসন্দেহে, স্যার। চমৎকার কোট-ও।'

'আচ্ছা!' মুচকি একটু হাসলো আগন্তুক। 'বাতাস তাহলে এ-দিকেই বইছে!' ঝট করে হাত বাড়িয়ে পিস্তল দুটো তুলে নিলো সে।

'উঁহু, অত তাড়াহুড়োর কিছু নেই। খামোকা একজন নিরীহ লোকের ওপর হামলা চালানোর কোনো দরকার আছে কি? ফ্রেঞ্চ সৈনিকের পোশাক আপনার গায়ে, অথচ কথা বলছেন স্কচ ভাষায়, কারো বুঝতে বাকি থাকার কথা নয় আপনি কি! তবে হ্যাঁ, আজ-কাল আপনার মতো সৎ, ভালো মানুষের সংখ্যা এত বেশি যে আমার সাহস হবে না, আপনার সম্পর্কে মুখ খোলার।'

'তার মানে কি? আপনিও একজন সৎ, ভালো মানুষ?'

'জি না, আমি খাঁটি প্রোটেস্টান্ট। আর সেজন্যে ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ আমি।'

এই প্রথম হোসিসনের মুখে ধর্ম সংক্রান্ত কথা শুনলাম। পরে জেনেছিলাম, যখন ডাঙায় থাকে সেসময় নাকি নিয়মিত গির্জায় যায়

সে। ভণ্ডামীর-ও একটা সীমা থাকা উচিত।

'বেশ, আপনি যা-ই হন,' বললো আগন্তুক, 'স্বীকার করছি আমি ঐ সৎ, ভালো মানুষদের একজন। মানে জ্যাকবাইট*। লাল কোর্তারা** তাড়া করছে আমাকে। সেজন্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফ্রান্সে পৌঁছাতে চাই। আমাকে তুলে নেয়ার কথা ছিলো এক ফরাশী জাহাজের। নৌকায় অপেক্ষা করছিলাম। এই সময় আপনার জাহাজ উঠে পড়ে আমার নৌকার ওপর।' একটু থামলো আগন্তুক। তারপর যোগ করলো, 'আমাকে ফ্রান্সে পৌঁছে দেবেন? যা ন্যায্য ভাড়া হয়, দেবো আপনাকে।'

'অসম্ভব!' বললো ক্যাপ্টেন। 'আমেরিকার পথে রয়েছি আমরা। তবে আপনি চাইলে কাছাকাছি কোথাও আপনাকে নামিয়ে দিতে পারি।' তারপর হঠাৎ করেই যেন তার চোখ পড়লো আমার ওপর। চিৎকার করে উঠলো, 'ডেভিড, যাও, খাবার নিয়ে এসো এই ভদ্রলোকের জন্যে।'

সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম আমি। রান্নাঘর থেকে খাবার নিয়ে যখন ফিরে

---

* সতর শতকে ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ড শাসন করতেন বৃটিশ বংশোদ্ভূত স্টুয়ার্টরা। ১৬৮৮ সালে স্টুয়ার্টরাজা দ্বিতীয় জেমসকে সিংহাসনচ্যুত করে ইংরেজরা, এবং ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের সিংহাসনে বসায় এক ইংরেজকে। অনেক স্কটসম্যানই মেনে নিতে পারেননি ব্যাপারটা। তারা স্টুয়ার্ট বংশের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে যায়। এদেরই নাম জ্যাকবাইট। ল্যাটিন 'জ্যকবাস' (Jacobus) থেকে এসেছে শব্দটা। অর্থ জেমস। ইংরেজ রাজার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে, নানা ভাবে বিদ্রোহ করে গেছে এই জ্যাকবাইটরা।

** সরকারী সৈন্য

এলাম রাউণ্ড-হাউসে, দেখলাম, কোমরের কাছ থেকে বেশ বড় একটা থলে খুলে আনছে আগন্তুক। থলে থেকে দু'তিনটে গিনি বের করে রাখলো সে টেবিলে। লোভে চক চক করে উঠলো হোসিসনের চোখ। একবার গিনি ক'টার দিকে তাকিয়েই থলেটার দিকে চোখ ফেরালো সে। তারপর আগন্তুকের মুখের দিকে।

'ঐ থলেতে যা আছে তার অর্ধেক দিলে আমি আপনার লোক!' চিৎকার করলো ক্যাপ্টেন।

নির্বিকার মুখে টেবিল থেকে গিনি ক'টা উঠিয়ে নিয়ে থলেতে পুরে ফেললো আগন্তুক। থলেটা ওয়েস্ট কোটের নিচে বেঁধে রাখতে রাখতে বললো, 'আপনাকে তো বলেছি, স্যার, এগুলো আমার নয়, আমার সর্দারের। ঠিকঠাক মতো পৌঁছে দিতে হবে তাঁর কাছে। ফ্রান্সে আছেন উনি। তবে আমাকে যদি লিনহে লক-এ পৌঁছে দেন তাহলে এর থেকে ষাটটা গিনি দেবো আপনাকে। হ্যাঁ, ষাটটা। এক-টাও বেশি নয়। নিলে নিন না হলে আপনার যা খুশি করতে পারেন।'

'আর যদি লাল কোর্তাদের হাতে তুলে দেই আপনাকে?'

'সেক্ষেত্রে আপনি এক পেনি-ও পাবেন না। সব চলে যাবে রাজার কোষাগারে।'

'আমি যদি না বলি তাহলে কি করে জানবে ওরা টাকার কথা?'

হা-হা করে হাসলো আগন্তুক। 'আপনি না বললে আমিই বলবো।'

এবার চিন্তায় পড়ে গেল ক্যাপ্টেন। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো।

'ঠিক আছে,' অবশেষে বললো সে। 'ষাট গিনিতেই রাজি আমি। লিনহে লক-এ পৌঁছে দেবো আপনাকে। এই যে আমার হাত। ভদ্রলোকের প্রতিশ্রুতি।'

'আর এই যে আমার।'

হু'জন করমর্দন করলো।

একটু পরেই ক্যাপ্টেন বেরিয়ে গেল রাউণ্ড-হাউস থেকে। আমি একা কেবল রইলাম আগন্তুকের সঙ্গে, তাকে খাওয়ানোর জন্যে।

দশ

জ্যাকবাইটদের সম্পর্কে কিছু কিছু জানি আমি। জানি ওরা ইংরেজ রাজার শত্রু। স্টুয়ার্ট বংশের এক রাজকুমারকে ওরা রাজা হিশেবে চেয়েছিলো। সেজন্যে লড়াই করতেও দ্বিধা বোধ করেনি। কিন্তু লড়াইয়ে জিততে পারেনি ওরা। ১৭৪৫ সালে চূড়ান্তভাবে পর্যুদস্ত হওয়ার পর অনেকেই সেই স্টুয়ার্ট রাজকুমারের সাথে পালিয়ে যায় ফ্রান্সে। অনেকে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করে সেখানে। কেউ কেউ মাঝে মাঝে আসে দেশে। অনুগত প্রজাদের কাছ থেকে গোপনে কর আদায় করে চলে যায় আবার। যারা আসে তারা প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই আসে। যারা ধরা পড়ে লাল কোর্তারা গুলি করে মারে তাদের।

অনেকক্ষণ চুপচাপ পর্যবেক্ষণ করলাম আমি জ্যাকবাইটটাকে। নিঃশব্দে খেয়ে চলেছে সে।

'আপনি তাহলে জ্যাকবাইট?' লোকটার পাতে মাংস তুলে দিতে দিতে আমি বললাম।

'হ্যাঁ,' খেতে খেতে জবাব দিলো সে। 'তুমি নিশ্চয়ই লুগগ* ?'

---

* রাজার অনুগতদের সে সময় এ নামে ডাকা হতো।

কথাটা সত্যি। তবু ওকে আহত করতে ইচ্ছে হলো না বলে বললাম, 'আসলে তা না। আমি মাঝামাঝি। হুইগ-ও না, জ্যাকবাইট-ও না।'

'তার মানে তোমার কোনো অস্তিত্বই নেই। যা হোক, মিস্টার মাঝামাঝি, তোমার এই বোতলটা তো শুকিয়ে গেছে। ষাটটা আস্ত গিনি দেবো, ঠিক মতো খাওয়াবে না?'

'একটু বসুন, আমি চাবি নিয়ে আসি।'

ডেকে নেমে এলাম আমি। কুয়াশা এখনো তেমনি আছে। এক-হাত দূরের জিনিসও দেখতে পাচ্ছি না। কিছুতে যেন ধাক্কা না খাই সেজন্যে হাত সামনে বাড়িয়ে পা টিপে টিপে এগোচ্ছি। ধারণা করছি হুইলের কাছে পাওয়া যাবে ক্যাপ্টেনকে।

কয়েক পা মাত্র এগিয়েছি, এমন সময় গলা শুনতে পেলাম হোসিসন আর তার দুই মেটের। ফিস ফিস করে কিছু একটা পরামর্শ করছে ওরা। ভালো কিছু সম্পর্কে যে নয় তা বুঝতে অসুবিধা হলো না। নিঃশব্দে আরেকটু এগোলাম আমি।

'রাউণ্ড-হাউস থেকে বের করে আনতে পারি না ওকে?' শুনতে পেলাম রিয়াকের গলা।

'না, যেখানে আছে সেখানেই থাক,' জবাব দিলো ক্যাপ্টেন। 'তলোয়ার ব্যবহার করতে পারবে না অত ছোট জায়গায়।'

'কথাটা সত্যি;' আবার রিয়াক, 'তবু ওর নাগাল পাওয়া খুব সহজ হবে বলে মনে হয় না।'

'জানি। সেজন্যেই একটা ফন্দি এঁটেছি আমি, শোনো, কিছুই জানি না, কিছুই ঘটেনি এমন ভঙ্গিতে যাবো আমরা রাউণ্ড হাউসে। বন্ধুর মতো আলাপ শুরু করবো। কথা বলতে বলতে তুমি ওর এক

পাশে গিয়ে দাঁড়াবে, আমি অন্য পাশে। তারপর আচমকা দু'জন দু'দিক থেকে ধরে বসবো ওর দু'হাত। তারপর যাবে কোথায়? এটা যদি পছন্দ না হয় আরো বুদ্ধি আছে, দু'জন দুই দরজা দিয়ে ঝড়ের বেগে ঢুকে আক্রমণ চালাতে পারি। ও কিছু বোঝার আগেই কাবু করে ফেলতে পারবো···।'

আর কোনো কথা কানে ঢুকলো না আমার। রাগে জ্বলে উঠলো সারা শরীর। এরা কি মানুষ, না পিশাচ? মাত্র ক'মিনিট আগে লোকটাকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, আর এখন ওর টাকা হাতানোর জন্যে প্রয়োজন বোধে খুন করার মতলব করছে!

আমার ক্রোধ আমাকে সাহস যোগালো। ধুপ ধাপ পা ফেলে এগিয়ে গেলাম ক্যাপ্টেনের কাছে।

'স্যার,' বললাম আমি, 'ভদ্রলোক এক বোতল ব্র্যাণ্ডি চাইছেন। চাবিটা একটু দেবেন?'

তিনজনই চমকে তাকালো আমার দিকে।

'হ্যাঁ, এই ছোকরা তো আমাদের সাহায্য করতে পারে!' উত্তেজিত গলায় বললো রিয়াক। 'আমাদের পিস্তল এনে দিতে পারে!'

'ঠিক ঠিক,' বললো ক্যাপ্টেন। হঠাৎ করেই লোকটার গলা কোমল আর মধুমাখা হয়ে উঠলো। 'তুমি খুব ভালো ছেলে, ডেভিড। আমি জানি তুমি আমাদের সাহায্য করবে। নিশ্চয়ই এর ভেতর বুঝে ফেলেছো, ঐ লোকটা জ্যাকবাইট। আমাদের রাজা জর্জের শত্রু। তার মানে আমাদেরও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে সরিয়ে দিতে হবে জাহাজ থেকে।'

একটু থেমে আবার শুরু করলো ক্যাপ্টেন, 'কিন্তু সমস্যা হলো, আমাদের সমস্ত বন্দুক পিস্তল রয়েছে রাউণ্ড-হাউসে, লোকটার নাকের

ডগায়। এমন কি, গুলি-বারুদ পর্যন্ত। বলা নেই কওয়া নেই আমরা যদি গিয়ে, ওগুলো বের করতে শুরু করি নিশ্চয়ই ও সন্দেহ করবে। কিন্তু তোমার মতো একটা ছেলে যদি এক চোঙা বারুদ আর গোটা দুই পিস্তল নিয়ে আসে কিছুই টের পাবে না ব্যাটা। কাজটা যদি তুমি করে দিতে পারো, আমেরিকায় পৌঁছে তোমাকে সাহায্য করবো আমি। ঐ লোকটার টাকার ভাগও দেবো। কি রাজি?

'জি, স্যার.' রুদ্ধশ্বাসে কোনো মতে বললাম আমি।

মদের আলমারির চাবিটা দিলো আমাকে ক্যাপ্টেন। ধীর পায়ে রওনা হলাম রাউণ্ড-হাউসের দিকে।

কি করবো আমি? হোসিসন আর তার চেলারা খুনে ডাকাত। ওরা চাইছে ওদের দুষ্কর্মের সাথী হই আমি। না! অসম্ভব। ওদের সাহায্য করতে পারি না আমি। আগন্তুক লোকটা খারাপ না ভালো, জানি না। জ্যাকবাইট হলেই একজন মানুষ খারাপ হয়ে যাবে এমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন নয় আমার মন। তাহলে? হোসিসনকে যদি সাহায্য না করি তাহলে ও এর শোধ নেবে। তাহলে কি আগন্তুককে সাহায্য করবো? ওকে জানিয়ে দেবো ওর বিরুদ্ধে কি ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে ক্যাপ্টেন আর তার মেটরা? সেক্ষেত্রেও বিপদ কম না। একটা ছেলে আর একজন মাত্র মানুষ, সিংহের মতো সাহসী ও যদি হয়, কি করতে পারবে হোসিসন, রিয়াক, শুহান আর ঐ সব বদমাশ খালাসীদের বিরুদ্ধে?

রাউণ্ড হাউসে ঢুকলাম আমি। এখনো নিঃশব্দে খেয়ে চলেছে লোকটা। একেবারে কাছে গিয়ে একটা হাত রাখলাম তার কাঁধে।

'আপনি কি খুন হতে চান?' সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলাম আমি।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো লোকটা।

'মানে ? কি বলতে চাও তুমি ?'

'ওরা আপনাকে খুন করার চক্রান্ত করছে। ওরা খুনী। জাহাজের সবাই। ক'দিন আগে খামোকা একটা ছেলেকে খুন করেছে। এবার আপনার পালা।'

'আচ্ছা, আচ্ছা ! তবে কথা হলো গিয়ে, ওরা এখনো ধরতে পারেনি আমাকে। ধরাটা সহজ ও হবে না ওদের পক্ষে।' তারপর আমার দিকে অদ্ভুত একটা দৃষ্টি হেনে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি দাঁড়াবে আমার পাশে ?'

'নিশ্চয়ই। আমি চোর নই, খুনী তো নই-ই। নিশ্চয়ই আমি দাঁড়াবো আপনার পাশে।'

একটা হাত বাড়িয়ে দিলো ও আমার দিকে। 'আমার নাম স্টুয়ার্ট, সবাই ডাকে অ্যালান ব্রেক বলে। তোমার নাম কি ?'

'ডেভিড ব্যালফোর, স্যার। শ বংশের ছেলে আমি।'

'শোনো আমাকে অত স্যার স্যার করবে না, আর আপনিও বলার দরকার নেই। তুমি-ই যথেষ্ট। এবার এসো, দেখি আত্মরক্ষার জন্যে কি কি ব্যবস্থা নিতে পারি আমরা।'

সঙ্গে সঙ্গে লেগে গেলাম রাউণ্ড-হাউসটা পরীক্ষা করার কাজে। দেখলাম দুটো দরজা আর মাথার ওপরের ফোকরটা দিয়েই কেবল সম্ভব ওদের পক্ষে আক্রমণ চালানো। সময় নষ্ট না করে একটা দরজা বন্ধ করে হুড়কো লাগিয়ে দিলাম। অন্য দরজাটাও বন্ধ করতে যাবো, বাধা দিলো অ্যালান ব্রেক।

'ওটা খোলাই থাক,' বললো ও। 'ওখান দিয়ে আসতে হবে ওদের। সেক্ষেত্রে আমার সামনাসামনি থাকবে ওরা। এবং সেটাই আমি চাই। শত্রু যখন মুখোমুখি থাকে তখন লড়াই করা অনেক সহজ।'

দেয়াল থেকে ছোট একটা তলোয়ার খুলে নিয়ে আমার হাতে দিলো। 'এটা রাখো তোমার কাছে, ডেভিড। এবার ঝটপট পিস্তলগুলোয় গুলিবারুদ ভরে ফেল তো।'

তলোয়ারটা কোমরে ঝুলিয়ে পিস্তলে গুলি ভরতে বসলাম আমি। এই অবসরে অ্যালান ব্রেক তার লম্বা তলোয়ারটা বের করে ধার পরীক্ষা করতে লাগলো। সাঁ সাঁ করে চালিয়ে দু'একটা ছোটখাটো জিনিস কেটে ফেললো।

'না, ঘরটা বড্ড ছোট,' অবশেষে বললো সে। 'ঠিক মতো তলোয়ার চালাতে পারবো না। যাকগে, কি আর করা! পিস্তলগুলোই এখন ভরসা। তাড়াতাড়ি গুলি ভরে ফেল।'

'এই তো হয়ে গেল বলে,' চটপটে ভঙ্গিতে বলার চেষ্টা করলেও গলার কাঁপুনিটা বোধহয় প্রকাশ হয়েই পড়লো। হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হয়ে গেছে আমার। মুখ, গলা শুকিয়ে কাঠ। স্বীকার করছি, ভীষণ ভয় করছে। মনে হচ্ছে, মৃত্যু একেবারে দোরগোড়ায়।

'ক'জন ওরা?' জিজ্ঞেস করলো অ্যালান।

ভেতরে ভেতরে এমন অস্থির হয়ে আছি, প্রথমে বুঝতেই পারলাম না প্রশ্নটার মর্ম। আবার করলো প্রশ্নটা। তখন কোনো রকমে মনে মনে গুণে জবাব দিলাম, 'জনা পনেরো হবে।'

'পনেরো!' অবাক হলো ও। তারপর একটু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, 'ঠিক আছে, চিন্তা কোরো না, আশা করি সামলাতে পারবো। খোলা দরজাটার ভার ছেড়ে দাও আমার ওপর। একটা কথা মনে রেখো, আমি যেদিকে থাকি সেদিকে কিন্তু গুলি চালাবে না। যদি চালাও হয় তো আমিই মারা পড়বো।'

'ঠিক আছে।'

'তোমার ওপর ভার থাকবে বন্ধ দরজাটার। ওরা হয়তো ভাঙার চেষ্টা করবে ওটা। ওপাশের জানালার কাছে ঐ বাঙ্কটায় উঠে পড়ো। ওখান থেকে তুমি দেখতে পাবে ওরা আসছে কিনা। যদি দেখ দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে, সোজা গুলি চালাবে!'

'আচ্ছা।'

'আর হ্যাঁ, আরো একটা দিকে চোখ রাখতে হবে তোমাকে।'

'কি?'

'ছাদের ঐ ফোকরটা।'

'কিন্তু—কিন্তু, একই সঙ্গে আমি দু'দিকে চোখ রাখবো কি করে? দরজার দিকে তাকালে ফোকরটার দিকে নজর রাখতে পারবো না, ফোকরটার দিকে নজর দিলে দরজার দিকে তাকাতে পারবো না।'

'কথাটা সত্যি। কিন্তু তোমার মাথায় কি কান নেই?'

'নিশ্চয়ই আছে।···হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার বুঝেছি, ওরা যখন ফোকরের কাচ ভাঙবে তখন শুনতে পাবো।'

'ঠিক! বেশ চালাক ছেলে তো তুমি!'

এগারো

দ্রুত ফুরিয়ে গেল সময়। ক্যাপ্টেনের মুখ দেখা গেল দরজায়। ভীষণ রেগে গেছে লোকটা আমার ওপর। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে তাকে। যখন দেখেছে পিস্তল তো দূরের কথা আমার-ই পাত্তা নেই তখন রেগে মেগে উঠে এসেছে ওদের পরিকল্পনা কাজে পরিণত করতে।

এক টানে খাপ থেকে তলোয়ার বের করলো অ্যালান। তলোয়ারের আগাটা হোসিসনের বুক বরাবর তাক করে চেঁচিয়ে উঠলো, 'ব্যস, আর এক পা-ও এগোবে না!'

থমকে দাঁড়ালো হোসিসন। বিস্মিত ভঙ্গি ফুটে উঠলো মুখে, কিন্তু ভয়ের লেশমাত্র না।

'খোলা তলোয়ার!' বললো সে। 'বেশ বেশ, অতিথি সেবার চমৎকার প্রতিদান যাহোক!'

'হো! হো! হো!' হেসে উঠলো অ্যালান। 'সুন্দর সুন্দর কথায় আর চিড়ে ভিজবে না, স্যার। এক পা ও এগিয়েছো কি তোমার হৃৎপিণ্ড সোজা ঢুকে যাবে আমার তলোয়ার। না কি হয়ে যাবে এক হাত? তাহলে ডাকো তোমার লোকদের। শুরু করা যাক!'

অ্যালানকে আর কিছু বললো না ক্যাপ্টেন্। মুখ কালো করে তাকালো আমার দিকে।

'কথাটা আমি ভুলবো না, ডেভিড,' হিস হিসে কণ্ঠে উচ্চারণ করলো সে।

সারা শরীরে কাঁপুনি তুলে কথা কটা মর্মে পৌছুলো আমার।

পরমুহূর্তে চলে গেল হোসিসন।

'তৈরি হও, ডেভিড!' বললো অ্যালান।

বাঁ হাতে লম্বা একটা ছোরা তুলে নিলো সে, ডান হাতে রইলো তলোয়ারটা। তলোয়ার ব্যবহারে অসুবিধা হলে ছোরা ব্যবহার করবে। দু'হাতে যতগুলো সম্ভব গুলিভরা পিস্তল নিয়ে জানালার পাশে বাঙ্কের ওপর উঠলাম আমি। জানালা খুলে গুড়ি মেরে বসে রইলাম সেখানে।

ভারাক্রান্ত হয়ে আসছে আমার হৃদয়। কেবলই মনে হচ্ছে, কিছু ক্ষণের ভেতর মরতে হবে। কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরকে ডাকতে লাগলাম। মনকে শক্ত করলাম। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে দেহের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে লড়বো। সবচেয়ে বড় কথা অন্যায়ভাবে লড়ছি না আমরা। লড়ছি একদল পশুর বিরুদ্ধে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে।

আচমকা ঘটতে শুরু করলো ঘটনা। প্রথমে অনেক লোকের এক সঙ্গে ধুপধাপ করে হেঁটে আসার আওয়াজ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তীব্র এক চিৎকার; তারপর অ্যালানের গর্জন, সাঁ করে তলোয়ার চালানোর আওয়াজ, পর মুহূর্তে একটা আর্ত চিৎকার, যেন আহত হয়েছে কেউ।

এতগুলো ঘটনা ঘটে গেল এক সেকেণ্ডের-ও কম সময়ের ভেতর। যখন আমি ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম খোলা দরজাটার দিকে, তখন

মিস্টার গুহানের মোকাবেলা করছে অ্যালান।

'এই ব্যাটাই খুন করেছিলো সেই ছেলেটাকে!' চিৎকার করলাম আমি।

'জানালার দিকে তাকাও!' আমার দিকে না তাকিয়ে উল্টো চিৎকার করলো অ্যালান। সেই সাথে তলোয়ারটা গেঁথে দিলো প্রথম মেটের শরীরে।

লোকটা কিভাবে লুটিয়ে পড়লো তা দেখার সৌভাগ্য, বা দুর্ভাগ্য হলো না আমার। তার আগেই চোখ ফিরিয়েছি জানালার দিকে। পাঁচ জনকে দেখলাম ছুটে যাচ্ছে জানালার পাশ দিয়ে। তাদের হাতে মোটা, লম্বা একটা কাঠের গুঁড়ি। বন্ধ দরজাটা ভাঙার চেষ্টা করবে বদমাশগুলো।

জীবনে কখনো পিস্তল চালাইনি। কিন্তু সেটা কোনো সমস্যাই হলো না। 'দাঁড়াও দেখাচ্ছি!' তীব্র এক গর্জন করে ঘোড়া টানলাম আমি।

পাঁচজনের একজন আর্তনাদ করে উঠলো। অন্যরা দাঁড়িয়ে পড়লো। পর পর আরো দুটো গুলি ছুঁড়লাম। একটা ওদের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। অন্যটা মাথার ওপর দিয়ে না গেলেও লাগলো না কারো গায়ে। কিন্তু কাজ হলো। আতঙ্কিত হয়ে গুঁড়ি ফেলে ছুটে পালালো ওরা।

দ্রুত একবার রাউণ্ড-হাউসের ভেতর চোখ বুলিয়ে নিলাম আমি। পুরো ঘরটা পিস্তলের ধোঁয়ায় ভরে গেছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে অ্যালান। রক্ত ঝরছে ওর তরবারি থেকে। মিস্টার গুহান পড়ে আছে মেঝেতে। তার মুখ দিয়ে রক্তের ধারা ছুটছে। আমি তাকানোর এক মুহূর্তপরেই কয়েকজন খালাসী মরিয়া হয়ে এগিয়ে এলো

দরজার কাছে। ঝুঁকে কোনো মতে ধরলো শুহানের একটা পা। তারপর পড়িমরি করে ছুটলো মৃতদেহটা টানতে টানতে।

'ক'টা ঘায়েল করেছো?' চিৎকার করলো অ্যালান।

'একটাকে আহত করেছি। আমার মনে হয় ওটা ক্যাপ্টেনই ছিলো।'

'আমি খতম করেছি দুটোকে। অবশ্য এতে ওদের শিক্ষা হবে মনে হয় না। শিগগিরই আবার আসবে ওরা। তার আগেই পিস্তল গুলোয় নতুন করে গুলি ভরে ফেল, ডেভিড। জানালার দিকে চোখ রাখবে।'

দ্রুত হাতে খালি পিস্তলগুলোয় গুলি বারুদ ভরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমারও ধারণা, শিগগিই আবার আসবে ওরা। এত সহজে হাল ছেড়ে দেবে না। ডেকের ওপর হৈ-চৈ শুনতে পাচ্ছি ওদের। চিৎকার করে কেউ কিছু নির্দেশ দিচ্ছে।

একটু পরে হঠাৎ করে থেমে গেল হৈ হট্টগোল। সাগর আর বাতাসের গর্জন ছাড়া আর কিছু শুনতে পাচ্ছি না। তারপরেই আমার কানে এলো শব্দটা। বেশ কয়েকজন মানুষ নিঃশব্দে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। ভয়েই হোক আর উত্তেজনায়-ই হোক, শব্দ না করে হাঁটতে পারছে না ওরা। একটু পরে মাথার ওপরে পেলাম শব্দ। রাউণ্ড-হাউসের ছাদে। একই রকম পা টিপে টিপে হাঁটার চেষ্টা। তারপর আবার সব চুপচাপ।

হঠাৎ নিচু একটা শিসের শব্দ ভেসে এলো আমার কানে—সংকেত দিলো কেউ। ঠিক সেই সময় মাথার ওপরে ফোকরটার কাঁচ ভেঙে পড়লো ঝন ঝন শব্দে। ওপর থেকে লাফিয়ে নামলো একজন লোক। লোকটা উঠে দাঁড়ানোর আগেই তার পিঠে পিস্তল ঠেকালাম আমি। গুলি করতে যাবো, হঠাৎ এক অদ্ভুত অনুভূতিতে ছেয়ে গেল মন।

যার পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছি তরতাজা একটা মানুষ সে। কি অধিকার আছে আমার ওকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার? হতে পারে ও খারাপ লোক, তবু মানুষ তো। মানুষ হয়ে আরেকটা মানুষকে কি করে খুন করবো আমি?

আমার দ্বিধা টের পেলো খালাসীটা। এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে গেল আমাকে। এতক্ষণে আমি বোকামি বুঝতে পেরেছি। ঝট করে এক পা পিছিয়ে এসে গুলি করলাম লোকটার পেট বরাবর।

তীব্র এক আর্ত চিৎকার করে লুটিয়ে পড়লো লোকটা, গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে পেট দিয়ে। এমন সময় একটা পা ঠেকলো আমার মাথায়। আরেকজন নামছে মাথার ওপরের ফোকর গলে। হাত বাড়িয়ে বাঙ্কের ওপর থেকে আরেকটা পিস্তল তুলে নিলাম আমি। গুলি করলাম লোকটার পা লক্ষ্য করে। সঙ্গীর নিষ্প্রাণ দেহের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো সে। নিজের কীর্তি দেখে নিজেই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলাম রক্তাক্ত লাশ দুটোর দিকে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম অমন করে বলতে পারবো না। অ্যালানের চিৎকারে সম্বিত ফিরলো আমার। নাবিকদের একজন কি করে যেন ঢুকে পড়েছে ভেতরে এবং জড়িয়ে ধরেছে ওকে। বাঁ হাতের ছোরা দিয়ে সমানে আঘাত করে চলেছে অ্যালান। কিন্তু সরাতে পারছে না লোকটাকে গায়ের ওপর থেকে। এই অবসরে আরো দু'তিনজন খালাসী ঢুকে পড়েছে রাউণ্ড হাউসে। সব ক'জন এক সাথে তলোয়ার তুলেছে। এক্ষুণি নামিয়ে আনবে অ্যালানের ঘাড় সোজা।

আমি আমার তরবারিটা তুলে নিয়ে ছুটলাম ওকে সাহায্য করার জন্যে। কিন্তু আমার সাহায্যের প্রয়োজন পড়লো না। তার আগেই

জড়িয়ে ধরা লোকটাকে হত্যা করলো ও। এক ঝটকায় মৃতদেহটা ঠেলে দিয়ে পিছিয়ে এলো দু'পা। তারপর মুখোমুখি হলো অন্য খালাসীদের। তিনজনের নেমে আসা তলোয়ার এক সাথে আঘাত করলো পতনোন্মুখ নাবিকের দেহে।

ইতিমধ্যে বিদ্যুৎচমকের মতো ঝলকে উঠতে শুরু করেছে অ্যালানের তলোয়ার। প্রতিটা আঘাতেই চিৎকার করে উঠছে কেউ না কেউ। কয়েক সেকেণ্ডের ভেতর আক্রমণকারীরা বুঝলো, গতিক সুবিধার নয়। রণে ভঙ্গ দিয়ে পালালো তারা। ওদের পেছন পেছন ছুটলো অ্যালান। ডেকের ওপর দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে গেল ফোরক্যাস্‌ল পর্যন্ত। লোকগুলোকে ফোরক্যাস্‌ল-এ নামিয়ে তবে ফিরে এলো ও।

কসাইখানার মতো চেহারা হয়েছে রাউণ্ড-হাউসের। তিনটে মৃতদেহ পড়ে আছে মেঝেতে। চতুর্থ একজন দরজার কাছে, ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জিতেছি আমি আর অ্যালান, এবং সম্পূর্ণ অক্ষত আছি।

দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলো অ্যালান আমার দিকে।

'ডেভিড!' চিৎকার করে জড়িয়ে ধরলো আমাকে। দুই গালে চুমু খেতে খেতে বললো, 'তুমি আমার ভাই! ওহ, দারুণ দেখিয়েছো! কেমন লড়ি আমি? ভালো না?'

মনের আনন্দে শিস দিতে দিতে নিহত আর আহত লোকগুলোকে এক এক করে রাউণ্ড-হাউসের বাইরে টেনে নিয়ে গেল অ্যালান। তারপর এসে বসলো টেবিলের ওপর। তলোয়ারটা এখনো ধরা রয়েছে হাতে। নিজের বানানো একটা গান গাইছে গলা ছেড়ে।

ভীষণ দুর্বল বোধ করছি আমি। দুই দুইজন লোককে হত্যা করেছি!

কথাটা কিছুতেই তাড়াতে পারছি না মন থেকে। ভার হয়ে চেপে বসে আছে বুকের ওপর। নিজের অজান্তেই ফুঁপিয়ে উঠে কাঁদতে শুরু করলাম আমি।

অ্যালান এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত রাখলো।

'তুমি খুব সাহসী ছেলে, ডেভিড,' কোমল গলায় বললো সে। 'এখন একটু ঘুম দরকার তোমার। ঘুম থেকে উঠে দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে। চমৎকার লড়েছো তুমি। গোটা একটা রাজ্যের বিনিময়েও আমি তোমাকে হারাতে চাই না।'

মাটিতে কম্বল পেতে শুয়ে পড়লাম আমি। অ্যালান জেগে রইলো। হাতে পিস্তল, হাঁটুর ওপর তলোয়ার। মাঝ-রাতে আমাকে জাগিয়ে দিয়ে ও ঘুমাবে।

তিন ঘণ্টা পর আমাকে জাগিয়ে দিলো অ্যালান। তারপর শুয়ে পড়লো আমার বিছানায়। বসে বসে পাহারা দিতে লাগলাম আমি। অ্যালান যে ভঙ্গিতে বসেছিলো ঠিক তেমন ভঙ্গিতে বসে আছি। হাতে পিস্তল, হাঁটুর ওপর তলোয়ার।

চারদিক নিস্তব্ধ। ডেকের ওপর কারো সাড়াশব্দ নেই। বাতাস পড়ে গেছে। কখন জানি বৃষ্টি নেমেছে। টিপ টিপ শব্দ হচ্ছে ছাদের ওপর। ভাঙা ফোকর দিয়ে পানি আসছে ভেতরে। সাগর শান্ত, মৃদু গর্জন শুনতে পাচ্ছি। জাহাজের চারপাশে সী গালের কর্কশ চিৎকার। ডাঙা বোধহয় খুব দূরে নয়।

বারো

ভোর ছ'টার সময় নাশ্‌তা করতে বসলাম আমি আর অ্যালান। কিন্তু মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা ভাঙা কাচ আর ছোপ ছোপ রক্তের দাগ খিদে কেড়ে নিয়েছে আমার। জাহাজের সেরা খাবারগুলো থাকে রাউণ্ড-হাউসে। সেগুলোই সব টেবিলে সাজানো, আমি নিজ হাতে সাজিয়েছি, অথচ মুখে তুলতে পারছি না কিছু।

হঠাৎ খাওয়া থামিয়ে একটা ছুরি তুলে নিলো অ্যালান। ওর দামী কোট থেকে একটা রূপার বোতাম কেটে ধরিয়ে দিলো আমার হাতে।

'আমার বাবা ডানকান স্টুয়ার্ট,' বললো ও, 'বোতামগুলো দিয়েছিলো আমাকে। আমি গত রাতের স্মরণে এর একটা তোমাকে দিচ্ছি। রাখো। যেখানেই যাও দেখিও বোতামটা, অ্যালান ব্রেকের বন্ধুরা সাহায্য করবে তোমাকে।'

বোতামটা নিয়ে পকেটে রেখে দিলাম।

খাওয়া শেষ হলো। গায়ের কাপড়গুলো এক এক করে খুলে ঝেড়ে মুছে পাট পাট করতে লাগলো অ্যালান। কাজটা অত্যন্ত যত্নের সাথে করলো ও। মেয়ে মানুষেরা যেমন করে নিজেদের পোশাকের যত্ন

নেয় ঠিক তেমন। খুব সাবধানে ব্রিচেস থেকে ধুয়ে ফেললো রক্তের দাগ। কাটা বোতামের জায়গা থেকে একটু একটু করে খুলে আনলো সবটুকু বেরিয়ে থাকা সুতো। তারপর আবার একে একে পরলো কাপড়-গুলো। ওর এই বাবুয়ানা ভঙ্গি দেখে হাসি এসে গেল আমার। কিন্তু হাসলাম না, পাছে আঁতে ঘা লাগে ওর। একটা ব্যাপার খেয়াল করেছি সহজেই রেগে যায় অ্যালান।

হঠাৎ ডেকের ওপর গলা শোনা গেল মিস্টার রিয়াকের। আমাদের ডাকছে। ছাদের ওপরের ফোকর গলে উঠে গেলাম আমি, হাতে পিস্তল। ফোকরটার কিনারে বসলাম পা ঝুলিয়ে। রিয়াকের সাথে চোখাচোখি হলো। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম একে অপরের দিকে। কেমন যেন ক্লান্ত আর অসুস্থ দেখাচ্ছে লোকটাকে। এ যেন সে নয় অন্য কোনো রিয়াক। বোধহয় সারা রাত আহতদের সেবা করতে হয়েছে বেচারাকে।

'জরুরী একটা কাজ।' অবশেষে মাথা নেড়ে সে বললো।

'দোষটা কার? নিশ্চয়ই আমাদের নয়!' দৃঢ় গলায় জবাব দিলাম আমি।

'ক্যাপ্টেন তোমার বন্ধুর সাথে কথা বলতে চায়।'

'আচ্ছা! এবার আবার কি ফন্দি এঁটেছে বদমাশটা?'

'না না, সত্যিই বলছি, ডেভিড, কোনো ফন্দি নয়। আর যদি করেও থাকে, ওর সাথী হবে না কেউ। খালাসীরা সব ক্ষেপে গেছে ওর ওপর।'

'আচ্ছা!'

'বিশ্বাস করো, ডেভিড, সত্যি বলছি আমি। শুধু খালাসীদের কথাই বা বলি কেন? আমি নিজেও মনে করি, যথেষ্ট হয়েছে

কষ্ট করে একটু হাসলো সে। 'অন্তত আমি আর নেই ওসব কাজের ভেতর। তোমার বন্ধুকে বলো, জানালায় দাঁড়িয়ে কথা বলবে ক্যাপ্টেন।'

ফোকরের কিনার থেকে নামলাম না আমি। পিস্তলের মুখও সরালাম না রিয়াকের দিক থেকে। শুধু মাথাটা সামান্য ঝুঁকিয়ে অ্যালানকে জানালাম রিয়াকের বক্তব্য। রাজি হলো অ্যালান।

এর পর মিস্টার রিয়াক এক মগ ব্র্যাণ্ডি চাইলো আমার কাছে। আমি দিলাম ওকে, অ্যালানের অনুমতি নেয়ার দরকার বোধ করলাম না। জায়গায় দাঁড়িয়ে অর্ধেকটা খেয়ে ফেললো রিয়াক। বাকি অর্ধেক সাথে নিয়ে চলে গেল ক্যাপ্টেনকে খবর দিতে।

একটু পরেই জানালার সামনে এসে দাঁড়ালো ক্যাপ্টেন। একটা হাত কাপড়ে বাঁধা অবস্থায় ঝুলছে গলা থেকে। সঙ্গে সঙ্গে অ্যালান পিস্তল তাক করলো তার বুকের দিকে।

বৃষ্টি শুরু হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। ভিজতে ভিজতেই আলাপ করলো ক্যাপ্টেন।

'ওটা না হলেও চলবে,' বললো সে। আমি তো প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, শুধু একটু কথা বলবো তোমার সাথে।'

'তোমার প্রতিশ্রুতি!' হাসলো অ্যালান। 'আর লোক হাসিও না। কানা কড়িও যদি মূল্য থাকতো তোমার কথার সত্যিই খুশি হতাম। আমি জাহাজে ওঠার পর একবার তো দিয়েছিলে প্রতিশ্রুতি। বিশ্বাস-ও করেছিলাম তোমাকে। তারপর কি হলো?'

'আচ্ছা আচ্ছা, ও নিয়ে আর কিছু বলবো না। আমি কোনো প্রতিশ্রুতি দেইনি, হলো? এবার কাজের কথায় আসি: আমার জাহাজের বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছো তুমি। খালাসীদের বেশির

ভাগকেই অকেজো করে দিয়েছো। আমার প্রথম মেটকে হত্যা করেছো। জাহাজ চালিয়ে নেয়ার মতো যথেষ্ট লোক নেই আমার। এখন কি করবো আমি? কাছের কোনো বন্দরে গিয়ে নোঙর করা ছাড়া গত্যান্তর নেই। আর তোমাকে জানিয়ে রাখছি, বন্দরে পৌঁছেই আমি খবর দেবো লাল-কোর্তাদের।'

'হো-হো-হো!' প্রাণ খুলে হাসলো অ্যালান। 'তারপর ওদের কাছে আমি প্রকাশ করবো তোমার দুষ্কর্মের কথা। ছি-ছি ছি! একটা বাচ্চা ছেলে আর একজন মাত্র লোকের বিরুদ্ধে পনেরো জন নাবিক! যাহোক, বহুদিন পর ওরা একটু হাসার সুযোগ পাবে।'

লাল হয়ে গেল হোসিসনের মুখ।

'না ওকাজ তুমি করবে না!' বলে চললো অ্যালান। 'প্রতিশ্রুতি মতো লিনহে লক-এ নামিয়ে দেবে আমাকে!'

'সম্ভব নয়। এই মাত্র কি বললাম তোমাকে? আমার প্রথম মেট মারা গেছে, নাবিকদের বেশির ভাগই আহত। জাহাজ চালাবে কারা? বললেই তো আর লিনহে লক পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যায় না। তাছাড়া এখানকার উপকূল সম্পর্কে আমাদের কারোই তেমন একটা ধারণা নেই। শুহানের ছিলো, ও মরে গেছে। মানচিত্রও নেই আমাদের কাছে।'

'ও সব কথা আমি শুনতে চাই না। আমার কথা আমি পষ্টাপষ্টি বলেছি। লিনহে লক-এ না পারো অ্যাপিন এ নামিয়ে দাও। তাও যদি না পারো আর্ভগউর-এ বা মরভেন-এ বা আরিস্যাইগ বা মোরার—মোট কথা আমার এলাকার ত্রিশ মাইলের ভেতর যেকোনো জায়গায় নামিয়ে দিতে পারো আমাকে।'

'তা অবশ্য পারি।' চিন্তিত হওয়ার ভান করলো হোসিসন। 'তবে

পয়সা লাগবে সেজন্যে।'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই! আমার কথা তো আমি তুলে নিইনি। কাছাকাছি কোথাও নামিয়ে দিলে ত্রিশ গিনি আর লিনহে লক-এ দিলে ষাট গিনি।'

'কিন্তু এ অবস্থায় লিনহে লক পর্যন্ত যাওয়া···,' ইতস্তত করছে ক্যাপ্টেন, 'খুব ঝুঁকির কাজ হয়ে যায়।'

'টাকা চাইলে ঝুঁকি নিতেই হবে। না চাইলে অবশ্য কথা নেই।'

'তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে?'

'বোধহয় না। আমি ডাঙার মানুষ। সৈনিক। লড়াই যতটুকু বুঝি সাগরের কাণ্ড কারখানা তার এক কণাও বুঝি না।'

ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ ভাবলো হোসিসন। অবশেষে মাথা ঝাঁকালো।

'ঠিক আছে। তবে একটা কথা আগেই বলে নিচ্ছি, পথে যদি রাজার কোনো জাহাজ আমাদের থামায়, আর তোমাকে ধরে নিয়ে যায়, তখন কিন্তু টাকা না দিয়ে যেতে পারবে না তুমি।'

'বেশ বেশ। আগে আসুকই তো রাজার জাহাজ।' তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে, 'ওহ হো! শুনলাম তোমাদের নাকি ব্র্যাণ্ডির খুব অভাব? নেবে নাকি এক বোতল দু'বালতি পানির বিনিময়ে?'

সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলো ক্যাপ্টেন। আমরা ওকে ব্র্যাণ্ডি দিলাম। ও দিলো পানি। রাউণ্ড-হাউসটাকে ধুয়ে মুছে সাফ করে ফেললাম আমি আর অ্যালান।

তেরো

সাফ-সুতরো করার কাজ তখনো শেষ হয়নি। এমন সময় উত্তর পূর্ব-দিক থেকে লাফিয়ে এলো এক দমক বাতাস। মেঘ উড়িয়ে নিয়ে গেল। একটু পরেই থেমে গেল বৃষ্টি। সূর্য উঠলো। পুরোপুরি পালটে গেল সকালের চেহারা। আমাদের মনও খুশি খুশি হয়ে উঠলো। রাউণ্ড-হাউসে বসে গল্পে মেতে উঠলাম আমি আর অ্যালান।

দুটো দরজা-ই খুলে দিয়েছি। আর কোনো ভয় নেই। খালাসীরা বেশির ভাগই আহত, ক্যাপ্টেন নিজেও। বাকিরা জাহাজ সামলাবে না আমাদের পেছনে লাগতে আসবে?

আমি আর অ্যালান পাশাপাশি বসেছি। ক্যাপ্টেনের দারুণ সুগন্ধি তামাক পাইপে ভরে ধূমপান করছে অ্যালান। দু'জনেরই কোলের ওপর তলোয়ার। পিস্তলগুলোও রয়েছে হাতের কাছে। মোট কথা আমরা গল্প করছি বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সতর্ক অবস্থায়।

আমি আমার জীবন-কাহিনী শোনালাম অ্যালানকে। সত্যিকারের বন্ধুর মতো ধৈর্য আর কৌতূহল নিয়ে শুনলো ও। কিন্তু যে মুহূর্তে আমি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী রাজ প্রতিনিধি মিস্টার ক্যাম্পবেলের নাম উল্লেখ করলাম, ভয়ানক ভাবে ক্ষেপে উঠলো অ্যালান।

'এই ক্যাম্পবেলদের কথা বলো না আমার সামনে,' চিৎকার করলো সে। 'দু'চোখে দেখতে পারি না ওদের। ঐ নামের সবাইকে আমি ঘৃণা করি।'

'কেন, অ্যালান?' একই সঙ্গে উদ্বেগ এবং কৌতূহল আমার গলায়। 'বলো আমাকে, কেন তুমি দেখতে পারো না ক্যাম্পবেলদের?'

'তুমি জানো, ডেভিড, আমি একজন স্টুয়ার্ট, অ্যাপিনের স্টুয়ার্ট। ক্যাম্পবেলরা আমাদের জাতশত্রু। নানা রকম ফন্দি ফিকির করে আমাদের বেশির ভাগ জমি দখল করে নিয়েছে ওরা। কথাটা খেয়াল কোরো, ফন্দি ফিকির করে, লড়াই করে নয় কিন্তু।' এখানে এসে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো ওর কণ্ঠস্বর। 'কিন্তু ওরা বলে বেড়ায়, ওরা নাকি আইন সঙ্গত উপায়ে নিয়েছে ওগুলো। মিথ্যেবাদীর দল!' টেবিলের ওপর প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুসি বসালো সে। 'সত্যি বলছি, ডেভিড, ওরা মিথ্যেবাদী! অভিশাপ দাও ওদের!'

কথাটা বিশ্বাস হলো না আমার। যাহোক, এ প্রসঙ্গে কিছু বললাম না অ্যালানকে। কারণ এ মুহূর্তে বন্ধুকে চটাতে চাই না আমি। তবু একটু খোঁচা মারতে ছাড়লাম না। বললাম, 'বোতামের ব্যাপারে এত বেহিশেবি তুমি, জীবনে উন্নতি করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'তা যা বলেছো।' একটু হাসলো সে। 'আসলে বোতামগুলো যার কাছ থেকে পেয়েছি বেহিশেবি স্বভাবটাও তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া। আমার বাবার কথা বলছি। ডানকান স্টুয়ার্ট, ঈশ্বর তাঁকে শান্তি দিন! বংশের সবচেয়ে সুপুরুষ লোক ছিলেন। তলোয়ারেও হাত ছিলো চমৎকার। সে তল্লাটে ওঁর মতো তলোয়ারবাজ আর কেউ ছিলো কিনা সন্দেহ। বাপের চেহারা না পেলেও স্বভাব আর লড়ার ক্ষমতা পেয়েছি ষোলআনা। বাবা নিজহাতে শিখিয়েছিলেন

আমাকে লড়াইয়ের কায়দা কানুন ।

'যা হোক, বাবার বেহিশেবিপনার কথা বলছিলাম—একবার লণ্ডনে রাজদরবারে তলোয়ার খেলা দেখানোর ডাক পড়লো তাঁর এবং আশ-পাশের আরো দু'জন ডাকসাইটে তলোয়ারবাজের। দু'ঘণ্টা একটানা লড়লেন তিনি বিভিন্নজনের সঙ্গে। সে লড়াই দেখার জন্যে উপস্থিত ছিলো রাজা জর্জ, রানী ক্যারোলিন, আর সেই কসাই কাম্বারল্যাণ্ড। এছাড়া আরো গণ্যমান্য লোকেরাও ছিলো সেখানে। লড়াই শেষে তিনজনের ওপরই খুব খুশি হলো রাজা। তিনটে করে গিনি উপহার দিলো একেক জনকে। গিনি তিনটে বাবা কি করেছিলেন জানো? প্রাসাদ থেকে বেরোনোর পথে ছিলো এক মুটের বাসা। ঐ বাসার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় মুটেকে ডেকে গিনি তিনটে দিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। বাড়ি ফিরেছিলেন খালি হাতে। এই হলো আমার বাবার স্বভাবের নমুনা। এখন বোঝো আমি কোত্থেকে পেয়েছি বেহিশেবি ...স্বভাব!'

'তার মানে তোমার জন্যে বিশেষ কিছু রেখে যেতে পারেননি উনি?' বললাম আমি।

'ঠিক তাই। এক প্রস্থ কাপড় আর সামান্য টুকটাক জিনিস ছাড়া আর কিছু রেখে যাননি ভদ্রলোক। তখন আর কি করি, পেট চালানোর জন্যে সৈন্যবাহিনীতে নাম লেখালাম। আমার জীবনে কলঙ্ক হয়ে আছে ঘটনাটা। এখনো, লাল কোর্তাদের একজন ছিলাম মনে হলেই গা ঘিন ঘিন করে ওঠে আমার।'

'কি?' চিৎকার করে উঠলাম আমি। 'তুমি ইংরেজ বাহিনীতে ছিলে?'

'হ্যাঁ। তবে ভুল বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে কেটে পড়েছি। তার-

পর যোগ দিয়েছি ঠিক দলে।'

'তার মানে দুই দুটো অপরাধ করেছো তুমি। এক, সেনাবাহিনী থেকে পালিয়েছো; দুই, রাজার বিরোধিতা করছো। ওরা পেলে তো নির্ঘাত ঝুলিয়ে দেবে তোমাকে।'

'হ্যাঁ, ওরা ধরতে পারলে অ্যালান ব্রেক বলে আর কেউ থাকবে না পৃথিবীতে। তবে ফ্রান্সের রাজার দেয়া একটা নিয়োগপত্র আছে আমার পকেটে সেজন্যে অতটা ঘাবড়াই না। ফরাশি সেনাবাহিনীর একজন সৈনিককে হত্যা করার আগে দুই বার ভাববে ওরা।'

'ফরাশি সেনাবাহিনীর সৈনিক তুমি? তাহলে এখানে এসেছো কেন? ফ্রান্সে থাকলেই পারো, কেউ কিছু করতে পারবে না তোমাকে।'

'সেই ছেচল্লিশ সাল থেকে বছরে একবার করে আসি দেশে।'

'কেন? সাহস দেখানোর জন্যে?'

'উঁহুঁ। দেশের লোকদের দেখতে। ফ্রান্স দেশটা চমৎকার সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার জন্মভূমির চেয়ে বেশি? অসম্ভব। অবশ্য শুধু এই কারণে যে আসি তা নয়, আরো কারণ আছে। ফরাশি সেনাবাহিনীর জন্যে দু'চারজন লোক সংগ্রহ করি, আর আমার ওস্তাদ আর্ডশিয়েলের প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে নিয়ে যাই।'

'আমি ভেবেছিলাম তোমার সর্দারের নাম অ্যাপিন।'

'হ্যাঁ, তবে আর্ডশিয়েল হলো গোত্রের প্রধান,' বললো অ্যালান। কিন্তু কিছুই পরিষ্কার হলো না আমার কাছে। 'বুঝলে, ডেভিড,' বলে চললো সে, 'এমন মহৎ লোক জীবনে দেখিনি। বংশমর্যাদা ও তেমন। এই লোককেই কিনা পরিবার পরিজন নিয়ে বাস করতে হচ্ছে ছোট্ট এক ফরাশি শহরে সাধারণ একজন দরিদ্র মানুষের মতো। কিন্তু ওঁর প্রজারা ওকে ভোলেনি। রাজা জর্জকে ওরা খাজনা

দেয়। তারপরেও আর্ডশিয়েলকে ওরা খাজনা দেয় গোপনে। আমি বছরে একবার এসে নিয়ে যাই সে খাজনা।'

'মানে বলতে চাও, ওরা বছরে দু'বার খাজনা দেয়?'

'হ্যাঁ, ডেভিড, হ্যাঁ। আমাদের দেশের এই কৃষকরা, বুঝলে, এদের মতো ভালো মানুষ আর হয় না।'

'সত্যিই, অ্যালান,' বললাম আমি, 'আমি জ্যাকবাইট নই, তবু ওদের এই মহত্ত্বের প্রশংসা না করে পারছি না।'

'জ্যাকবাইট না হলেও, ডেভিড, আমি মনে করি তুমি ভদ্রলোক। ক্যাম্পবেলরা যেমন হয় তুমি তেমন নও।' একটু থামলো অ্যালান। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বললো, 'ওদের সবচেয়ে জঘন্য লোকটার নাম কলিন ক্যাম্পবেল, গ্লেনিউর-এর কলিন রয় ক্যাম্পবেল। আমরা বলি "লাল-শেয়াল"। আমাদের জমাজমি সব জোচ্চুরি করে নেয়ার পেছনে ওরই ছিলো মুখ্য ভূমিকা। কি করে জানি জানতে পেরেছে কৃষকরা রাজার পাশাপাশি আর্ডশিয়েলকেও খাজনা দেয়। শুনে ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো হয়ে উঠেছে ও। খবর পেয়েছি বদমাশটা নাকি লাল-কোর্তাদের নিয়ে অ্যাপিন-এ আসছে। কৃষকদের ভিটেমাটি, ছাড়া করবে। হ্যাঁ, ডেভিড, রীতিমতো আতঙ্কের ভেতর দিন কাটাচ্ছে আমার দেশের নিরীহ চাষীরা। প্রতিদিন সূর্য ওঠার সাথে সাথে ওদের পেয়ে বসে একটা মাত্র চিন্তা, আজই বোধহয় এলো লাল শেয়াল লাল কোর্তাদের নিয়ে। সত্যিই যদি আসে, আমি ওকে খুন করবো, ডেভিড। ঈশ্বরের কসম খেয়ে বলছি, খুন করবোই।'

'ছি, অ্যালান, তুমি অমন কাজ করতে যাবে কেন? ঈশ্বরই ওকে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন।'

'ধুর! তুমিও দেখছি ক্যাম্পবেলদের মতোই কথা বলছো।'

এ নিয়ে আর কথা বাড়ালাম না আমি। প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাদের এলাকায় তো অসংখ্য লাল-কোর্তা নিয়মিত টহল দেয়, ওদের চোখ এড়িয়ে যাওয়া আসা করো কি করে?'

'লাল কোর্তারা তো আর সব সময় সব জায়গায় থাকে না। ওরা রাস্তায় থাকলে আমি বনে ঢুকে পড়ি। ওরা বনে থাকলে আমি লুকিয়ে পড়ি পাহাড়ে। আমার গোত্রের কৃষকরা আমাকে সাহায্য করে। মাঝে মাঝে ওদের বাড়িতে ঘুমাই আমি। কখনো ঘুমাই খোলা আকাশের নিচে, মাঠে, ঝোপের ভেতর। মোট কথা, কোনো ঠিক-ঠিকানানেই। যখন যেমন অবস্থা তখন তেমন করে কাটে দিন।'

না, আমি জ্যাকবাইট নই। তবু অ্যালান ব্রেক মহান এক নায়ক হয়ে উঠলো আমার কাছে।

চোদ্দ

সেদিনই। রাত নেমেছে প্রকৃতিতে। কিন্তু বিকেলের মতো পরিষ্কার চারদিক। (বছরের এ সময়টায় এ অঞ্চলে গভীর রাতেও বেশ আলো থাকে)।

ক্যাপ্টেন হোসিসনকে দেখা গেল রাউণ্ড-হাউসের দরজায়।

'একটু বাইরে আসবে?' অ্যালানের দিকে তাকিয়ে সে বললো। 'দেখতো পথ চিনিয়ে নিতে পারো কিনা।'

'আবার কোনো ফন্দি?' বললো অ্যালান।

'আমার চেহারা দেখে কি তাই মনে হচ্ছে? দেখ, বাজে কথা বলে নষ্ট করার মতো সময় আমার হাতে নেই। সামনে সমূহ বিপদ!'

'কি হলো আবার?'

'জাহাজ বাঁচানো সম্ভব হবে কিনা বুঝতে পারছি না!'

ক্যাপ্টেনের উদ্বিগ্ন ভঙ্গিটা খাঁটি বলেই মনে হলো। গলার স্বরেও উৎকণ্ঠা স্পষ্ট। এই কণ্ঠস্বর যদি মেকি হয় তাহলে বলতে হবে ক্যাপ্টেন হোসিসন একজন পাকা অভিনেতা।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা বেরিয়ে এলাম ডেকে। আকাশ পরিষ্কার। এমনিতে অন্ধকার তত গাঢ় নয়, তার ওপর চাঁদ প্রায় গোল। আলোর

কমতি নেই। দ্রুত এগিয়ে চলেছে কভেন্যান্ট।

'ওদিকে দেখ!' ডুবো পাহাড়ের দিকে ইশারা করলো ক্যাপ্টেন। খুব দূরে নয়। তরঙ্গসঙ্কুল সাগর আছড়ে পড়েছে সেগুলোর গায়ে। 'ওর ওপাশে যদি আরেক সারি থাকে তাহলেই হয়েছে।'

বলতে না বলতেই একটু দক্ষিণে সত্যি সত্যিই আরেক সারি পাহাড় দেখা গেল।

'দেখ!' চিৎকার করে উঠলো হোসিসন। 'নিজের চোখেই দেখ! এর ভেতর দিয়ে জাহাজ চালিয়ে কি ভাবে তীরে পৌঁছুবো? সাথে যদি মানচিত্র থাকতো, অসুবিধা ছিলো না, নিদেনপক্ষে শুহান বেঁচে থাকলেও চলতো। স্যাটকেন, ছয়শো গিনি দিলেও আমি রাজি হতাম না এখানে আসতে। খালি···খালি···তুমি···। যাকগে, এখন বলো পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে কিনা?'

'ভাবছি,' বললো অ্যালান, 'এ পাহাড়গুলোর নাম···আঁ··· সম্ভবত টোরান শৈলশ্রেণী। আর ঐ যে ও দিকে, ওটা হলো মুল দ্বীপপুঞ্জ।

'এরকম পাহাড় কি অনেক আছে এ অঞ্চলে?'

'সত্যি কথা বলতে কি, আমি ঠিক জানি না। তবে যতদুর মনে পড়ছে দশ মাইল এলাকা নিয়ে বিস্তৃত ঐ পাহাড়গুলো।'

রিয়াক আর ক্যাপ্টেন মুখ চাওয়া চাও-ই করে নিলো একবার।

'ওগুলোর ভেতর দিয়ে পথ আছে নিশ্চয়ই?'

'নিঃসন্দেহে,' বললো অ্যালান। 'কিন্তু প্রশ্ন হলো, কোথায়? একবার যেন কার কাছে শুনেছিলাম, এ অঞ্চলে উপকুলের কাছ দিয়ে জাহাজ চালানোই নিরাপদ।'

মিস্টার রিয়াককে পাঠিয়ে দিলো ক্যাপ্টেন মাস্তুলের মাথায় উঠে দেখার জন্যে, অ্যালানের কথা ঠিক কিনা।

তক্ষুণি মাস্তুল বেয়ে উঠতে শুরু করলো রিয়াক। একটু পরেই ওপর থেকে তার চিৎকার শোনা গেল—

'হ্যাঁ, ডাঙার কাছ দিয়ে সাগর অনেক পরিষ্কার।'

'ঠিক আছে। তুমি থাকো ওখানে,' চেঁচালো ক্যাপ্টেন। তারপর ঘুরিয়ে দিলো হাল। মূল দ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূল লক্ষ্য করে জাহাজ চালাচ্ছে সে।

জাহাজ যত তীরের দিকে এগোচ্ছে ততই ডুবো পাহাড়ের সংখ্যা বেড়ে উঠছে। একটা থেকে অন্যটার দূরত্ব খুব কম। জাহাজ যেতে পারবে না ও ফাঁকের ভেতর দিয়ে। হালের চাকা নিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে ক্যাপ্টেন আর দুই খালাসী। পাংশু হয়ে উঠেছে তাদের চেহারা।

অ্যালানের দিকে তাকালাম আমি। ওর মুখটাও কেমন যেন ফ্যাকাশে।

'ব্যাপারটা মোটেই ভালো লাগছে না আমার,' বললো সে।

ইতিমধ্যে আমার মনেও কেমন একটা ভয় সংক্রামিত হতে শুরু করেছে। অ্যালানের কথায় তার পরিমাণ বাড়লো একটু।

'ওহ্, অ্যালান,' রুদ্ধশ্বাসে বললাম আমি, 'নিশ্চয়ই তুমি ভয় পাওনি?'

'না! না!···কিন্তু···কিন্তু···ঐ যে বললাম, ভালো লাগছে না আমার! এভাবে···এমন হিম শীতল মৃত্যু কে চায়?'

'ডুবো পাহাড়গুলোর ভেতর দিয়ে এঁকে বেঁকে তীরের বেশ কাছে এসে পড়েছি আমরা।

'সামনে পরিষ্কার সাগর!' মাথার ওপর থেকে চেঁচালো রিয়াক।

'মনে হচ্ছে, ঠিকই বলেছিলে তুমি,' অ্যালানের দিকে ফিরে বললো ক্যাপ্টেন। 'এ যাত্রা বোধহয় বেঁচে গেল আমার কভেন্যান্ট।'

'ডান পাশে একটা ডুবো পাহাড়!' আবার রিয়াকের চিৎকার। 'সামান্য বাঁয়ে কাটো।'

'ঠিক সেই সময় জোয়ারের স্রোত ধরে ফেললো জাহাজটাকে। একই সঙ্গে, মাত্র মুহূর্তের ব্যবধানে, প্রথমে পড়ে গেল তারপর অন্য দিক থেকে বইতে শুরু করলো বাতাস। সাঁ করে নিজের অক্ষের ওপর আধ পাক ঘুরলো কভেন্যান্ট। পর মুহূর্তে প্রচণ্ড শব্দ তুলে ধাক্কা খেলো ডুবো পাহাড়টার সাথে।

মড়মড় করে উঠলো জাহাজের কাঠামো। আমরা সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম ডেকের ওপর। মিস্টার রিয়াক মাস্তুলের ওপর থেকে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল কোনোমতে।

ডেকের ওপর পড়ে ক'টা গড়ান খেয়েছি জানি না। সম্বিত ফিরতেই উঠে দাঁড়ালাম তড়াক করে। চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। সাগরের ঢেউ বারবার কভেন্যান্টকে ঠেলে দিচ্ছে ডুবো-পাহাড়টার দিকে! প্রতিবারই মচ-মচ করে উঠছে জাহাজের কাঠ। সাগর আর বাতাসের গর্জনে কান পাতা দায়। মাথার ভেতর ভোঁ-ভোঁ করছে আমার। মনে হচ্ছে এই বুঝি ফেটে চারপাশে ছিটকে পড়বে ঘিলু।

ইতিমধ্যে নাবিকরাও উঠে দাঁড়িয়েছে। সবাই ছুটে গেছে জাহাজের নৌকা রাখা হয় যেখানে সেদিকে। একটু পরেই দেখলাম নৌকাটাকে জাহাজের কিনারে নেয়ার জন্যে ঠেলাঠেলি করছে ওরা। সম্ভবত জলে নামতে চায়। ছুটলাম আমি ওদের দিকে। যেতে যেতে দেখলাম কয়েকজন আহত নাবিক হামাগুড়ি দিয়ে চেষ্টা করছে নৌকার কাছে যাওয়ার। কি করে ওরা ফোরক্যাস্‌ল থেকে বেরিয়ে এলো, ভেবে অবাক না হয়ে পারলাম না। যে খালাসীদের অবস্থা আরো করুণ,

নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই, তাদের আর্ত চিৎকার ভেসে আসছে ফোর-ক্যাস্‌ল থেকে। করুণ কণ্ঠে আবেদন জানাচ্ছে তাদের যেন বাঁচানো হয়। হঠাৎ অদ্ভুত এক আর্দ্র অনুভূতিতে ছেয়ে গেল আমার মন। পর মুহূর্তে সচেতন হলাম। ওদের এ অবস্থা না করলে ওরা আমাদের কি অবস্থা করতো, মনে পড়ে গেল। ওদের আর্তনাদে কান না দিয়ে এগিয়ে গেলাম নৌকার দিকে।

ক্যাপ্টেন বেচারি শোকে পাথর হয়ে গেছে যেন। যেখানে পড়ে গিয়েছিলো সেখানেই বসে আছে স্থানুর মতো। তার জাহাজ ভেঙে পড়ছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া কিছুই করতে পারছে না সে। ডুবো পাহাড়ের সাথে ধাক্কা খেতে খেতে জাহাজটার বিভিন্ন অংশ যখন খুলে খুলে পড়তে লাগলো তখন ডুকরে কেঁদে উঠলো সে। জাহাজটাই ছিলো এই পৃথিবীতে তার একমাত্র অবলম্বন—বাড়ি-ঘর, ব্যবসা, মা, স্ত্রী, সন্তান। শুহান যখন ব্ল্যানসমকে খুন করে ফেলে তখনও কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি হোসিসনের ভেতর, কিন্তু আজ যখন নির্দয় সাগর তার জাহাজটাকে একটু একটু করে হত্যা করছে তখন আর সহ্য করতে পারছে না সে।

'ওটা কোন জায়গা?' তীরের দিকে ইশারা করে আমি অ্যালানকে জিজ্ঞেস করলাম।

'ক্যাম্পবেলদের দেশ—আমার জন্যে নিষিদ্ধ এলাকা,' জবাব দিলো অ্যালান।

সবাই মিলে ঠেলাঠেলি করে নৌকাটাকে নিয়ে এসেছি জাহাজের কিনারে। আহত এক খালাসীকে নজর রাখতে বলা হয়েছিলো সাগরের দিকে। হঠাৎ আতঙ্কিত গলায় চিৎকার করে উঠলো সে:

'ঈশ্বরের দোহাই! ধরো কিছু একটা!'

ওর কণ্ঠস্বর শুনেই বুঝলাম মারাত্মক কিছু একটা ঘটতে চলেছে। হাত বাড়িয়ে একটা রশি ধরতে গেলাম। কিন্তু তার আগেই বজ্রপাতের মতো গর্জন করে এসে পড়লো বিশাল ঢেউটা। অনেক উঁচুতে তুলে ফেললো নড়বড়ে হয়ে যাওয়া জাহাজটাকে। পর মুহূর্তে আমি পানির ভেতর আবিষ্কার করলাম নিজেকে।

ডুবে গেলাম আমি। তারপর ভেসে উঠলাম আবার। আবার ডুবলাম। কথায় বলে ডুবে মরার আগে মানুষ তিনবার পানির নিচে যায় আর ওঠে। আমার ক্ষেত্রে কথাটা খাটলো না, বলতে পারবো না, কতবার যে আমি ডুবলাম আর ভাসলাম। বুনো, খেয়ালী সাগর লোফালুফি করতে লাগলো আমাকে নিয়ে। জাহাজের কাছ থেকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল অনেক দূরে। ভাগ্যক্রমে ভাসমান একটা কাঠের টুকরো পেয়ে গেলাম। আঁকড়ে ধরলাম ওটা। সাঁতার ভালো জানি না। কাঠের টুকরোটা না পেলে আমার মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারতো না। ঢেউ আর সমুদ্রস্রোত কাঠটার সাথে সাথে আমাকেও ভাসিয়ে নিয়ে গেল তীরের কাছাকাছি শান্ত পানিতে।

পেছন ফিরে তাকালাম। দেখতে পেলাম জাহাজটাকে। এখনো তেমনিভাবে একটু পর পর ধাক্কা খাচ্ছে ডুবো পাহাড়টার সাথে। চিৎকার করে ডাকলাম আমি অ্যালানের নাম ধরে; ক্যাপ্টেন হোসি-সন, রিয়াকের নাম ধরে। ওরা কেউ শুনতে পেলো না।ঢেউ অনেক দূরে নিয়ে এসেছে আমাকে।

উপকূলের শাদা পাহাড়গুলো চাঁদের আলো পড়ে চকচক করছে। প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়ে ওগুলোর দিকে এগোনোর চেষ্ট করলাম আমি। অবশেষে অগভীর পানিতে পৌঁছুতে পারলাম। কষ্টে সৃষ্টে আরেকটু এগোলাম। হাঁটু পানি। এবার হেঁটে রওনা হলাম পাড়ের

দিকে। তীরে যখন পৌছুলাম তখন প্রচণ্ড ক্লান্তিতে অবশ হয়ে আসতে চাইছে শরীর। তা আসুক, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, নিরাপদে তীরে পৌছুতে পেরেছি, অ্যালানের সেই হিমশীতল মৃত্যুকে বরণ করতে হয়নি।

পনেরো

জনমানবহীন এক সৈকতে এসে উঠেছি। বরফের মতো ঠাণ্ডা বাতাস বইছে সাগরের দিক থেকে। সারা শরীর ভেজা, তার ওপর এই বাতাস ; হাত-পা জমে যাওয়ার দশা হলো আমার। ঠাণ্ডা যেন বসে না যায় সে জন্যে জুতো খুলে ফেললাম। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে ভেঙে আসতে চাইছে শরীর তবু একটু বসার বা বিশ্রাম নেয়ার কথা ভাবতে পারলাম না। শরীর গরম রাখার জন্যে সৈকতের ওপর পায়চারি করতে লাগলাম। রাত যত গভীর হচ্ছে অন্ধকার তত গাঢ় হয়ে আসছে। চাঁদ হেলে পড়েছে একদিকে। মানুষ তো দূরের কথা, জন্তু এমন কি একটা মুরগির-ও আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। বাতাস আর সাগরের একটানা ভয়ঙ্কর গর্জন শুধু। নির্জন সৈকতে একা আমি, কথাটা মনে হতেই গা ছম ছম করে উঠছে।

দিনের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জুতো পরে নিলাম আমি—এতক্ষণে মোটামুটি শুকিয়েছে ওটা। কোথায়, কেমন জায়গায় এসে পড়েছি জানার জন্যে কাছেই একটা পাহাড় দেখে উঠতে শুরু করলাম সেটার ওপর। বড় বড় গ্রানাইটের চাঙড়ে পা বাঁধিয়ে একটু একটু করে উঠে গেলাম ওপরে। অবশেষে চূড়ায় পৌছুলাম। ইতি-

মধ্যে পুবের আকাশ রাঙা করে সূর্য উঠতে শুরু করেছে।

প্রথমেই তাকালাম সেই ডুবো পাহাড়ের দিকে—যেটায় ধাক্কা খেয়েছিলো কভেনান্ট। পাহাড়টা দেখতে পেলাম, কিন্তু জাহাজের কোনো চিহ্ন নজরে পড়লো না। নির্ঘাৎ ডুবে গেছে। নৌকাটা-ও দেখতে পেলাম না কোথাও। জাহাজের ভাঙাচোরা কোনো টুকরো পর্যন্ত চোখে পড়লো না। বিষণ্ণ মনে চার পাশে তাকালাম এবার আমি। এখানেও সেই শূন্যতা। কোথাও কিছু নেই। মানুষ না, জন্তু না, ঘর না, কিছুই না।

একগাদা প্রশ্ন ভীড় করে এলো আমার মনে। অ্যালান কোথায়? জাহাজটার কি হয়েছে? ওটার ক্যাপ্টেন আর নাবিকদের অবস্থাই বা কি? অনেকক্ষণ ভেবেও কোনো সমাধান পেলাম না। বুঝতে পারলাম না, ওরা বেঁচে আছে না মরে গেছে।

অবশ্য এ নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবার অবকাশ পেলাম না। আমার নিজের দুরবস্থা ভাবনা চিন্তা সব দূর করে দিলো। এ মুহূর্তে আমার যা অবস্থা তাকে দুরবস্থা বললে কম বলা হয়। ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি। তার ওপর প্রচণ্ড ক্ষুধা আর ঠাণ্ডা। সূর্য আর একটু উঠে এলে একটা সমস্যার হাত থেকে অন্তত বাঁচবো—গায়ের কাপড়-গুলো শুকাবে, ঠাণ্ডাও একটু কমবে। কিন্তু ক্ষুধা আর ক্লান্তি? এগুলোর হাত থেকে বাঁচবো কি করে? যে করেই হোক এখন একটা আশ্রয়—জন বসতি খুঁজে বের করতে হবে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলাম আমি।

সৈকতের ওপর দিয়ে চললাম। কিছুক্ষণ পর একটা খাঁড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো আমাকে। সাগরের সরু একটা বাহু ঢুকে গেছে ডাঙার ভেতর দিকে। খাঁড়ির তীর ধরে এগোলাম কিছুক্ষণ।

যত এগোচ্ছি ততই ক্রমশ চওড়া হচ্ছে খাঁড়িটা। আরো কিছুদূর হাঁটলাম। আরো চওড়া হয়েছে খাঁড়ি। অনেক দূরে অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে ওপার। অবশেষে বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা। আসলে খাঁড়ি নয়, একটা দ্বীপের উপকূল ধরে হেঁটে চলেছি আমি। জন মানবহীন ছোট্ট একটা দ্বীপ। এ দ্বীপে তো আশ্রয় পাওয়ার আশা নেই। তাহলে কি করবো আমি এখন?

এমন সময় বুদ্ধিটা এলো মাথায়: সাঁতরে পার হতে পারি না দুই দ্বীপের মাঝখানের সাগরটুকু? কতটা গভীর এখানে সাগর? যদি অল্প হয় তাহলে বোধহয় পারবো। দেখি চেষ্টা করে। খাঁড়ি যেখানে সবচেয় সরু সেখানে ফিরে এলাম আবার। গভীরতা মাপার জন্যে নামলাম সাগরে। পা পিছলে গেল হঠাৎ। পরমুহূর্তে সোজা হতে গিয়ে খেয়াল করলাম, পা ঠেকছে না মাটিতে। আঁতকে উঠে হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করলাম। সামান্য এগোলাম ডাঙার দিকে। একটু পরে থই পেলাম মাটির। ও বাবা, বড় বাঁচা বেঁচে গেছি। সাঁতরে পার হওয়ার বুদ্ধিটা কাজে লাগবে না বোঝা হয়ে গেছে।

এবার? হঠাৎ করেই মনে পড়ে গেল সেই কাঠের টুকরোটার কথা—যেটা আঁকড়ে ধরে বেঁচে ছিলাম কাল রাতে! ছুটে গেলাম ওটা খোঁজার জন্যে। পেলাম না। ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সাগর।

একটু পরে মরার ওপর নেমে এলো খাঁড়ার ঘা। রোদ ঢাকা পড়ে গেল মেঘের আড়ালে। বৃষ্টি শুরু হলো। সহজাত প্রবৃত্তির বশেই আবার তাকালাম চার পাশে আশ্রয়ের সন্ধানে। কিছুই চোখে পড়লো না এবারও। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই।

কান্না পেয়ে গেল আমার। জাহাজডুবির পর নির্জন দ্বীপে ওঠা

মানুষের গল্প অনেক শুনেছি, পড়েছি। তাদের সবারই কাছে ছিলো পকেট ভর্তি যন্ত্রপাতি নয় তো জোয়ারে ভেসে আসা সিন্দুক। কিন্তু আমার অবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা। কিছু টাকা আর এলানের দেয়া সেই রূপার বোতামটা ছাড়া আর কিছু নেই আমার পকেটে।

সারাদিন চললো বৃষ্টি। ঠকঠকিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভিজলাম আমি সারাদিন। অবশেষে সন্ধ্যা হলো। রাত হলো। থামলো না বৃষ্টি। পাহাড়ের ঢালে দুটো বড় পাথরের মাঝখানে আশ্রয় নিলাম আমি। তাতে মাথাটা বাঁচলো বৃষ্টির হাত থেকে। কিন্তু শরীর সম্পূর্ণ রইলো পানির ভেতর। এই অবস্থায়ও কখন যে ঘুমিয়ে গেলাম টেরই পেলাম না।

পরদিন সকালে জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে ঘুম ভাঙলো আমার। গলার ভেতর অসম্ভব ব্যথা। কি করবো কিছু বুঝতে পারছি না। নতুন জন্ম নেয়া শিশুর মতো অসহায় মনে হচ্ছে নিজেকে। আশা করার মতো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না সামনে। সাগরের কাছাকাছি কোথাও যদি জন্ম হতো, হয়তো এমন অসহায় লাগতো না। কিন্তু আমি গ্রামের ছেলে; সাগর, দ্বীপ এসব সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। এ মুহূর্তে আমার যে কষ্ট তাকে সামান্য কমানোর মতো জ্ঞান-ও আমার নেই।

দুই পাথরের মাঝখানে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। দুই রাত এক দিন কোনো কিছু পেটে পড়েনি। খিদেয় প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার অবস্থা। কিন্তু কি খাবো? প্রচুর পাখি আছে দ্বীপে। পাহাড়ের চূড়ায় বসছে আবার উড়ে যাচ্ছে। ধরতে বা মারতে পারলে খাওয়া যেতো। ধরার চিন্তা প্রথমেই বাদ দিলাম। নিজেরই নড়ার শক্তি নেই, তো পাখি ধরবো কি করে? মারার কথা ভাবলাম তারপর। বন্দুক

নেই আমার কাছে। মারলে ঢিল ছুঁড়েই মারতে হবে। চেষ্টা করলাম। কিন্তু বার দুয়েক ঢিল ছুঁড়ে বুঝতে পারলাম কি অসম্ভব একটা আশা আমি করছি।

মাছ? সাগরে তো প্রচুর মাছ আছে। কিন্তু এখানেও সেই একই সমস্যা, মাছ ধরবো কি করে খালি হাতে? তারপর ওগুলো রান্নার ব্যবস্থাই বা করবো কি করে? অবশেষে সৈকতের ওপর এক জায়গায় কিছু ঝিনুক দেখতে পেলাম। পাথরের খাঁজে আটকে আছে। কয়েকটা ঝিনুক খোলা ছাড়িয়ে খেয়ে নিলাম কাঁচা। অনেক কষ্টে বমি ঠেকালাম। এমন প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে যে, এখন কিছু না খেলে মরেই যাবো। বহু লোকের কাছেই ঝিনুক খুব প্রিয় খাবার। কিন্তু কাঁচা নিশ্চয়ই নয়? সত্যিই কাঁচা ঝিনুকের সে স্বাদ আর দুর্গন্ধ ভোলবার নয়।

যা হোক, যত খারাপই লাগুক খেতে, আপাতত খিদে মিটলো। গায়ে জ্বর নিয়েই আবার হাঁটতে লাগলাম দ্বীপের চারপাশ দেখার জন্যে। ছোট একটা পাহাড়ের মাথায় চড়লাম। সামান্য দূরে দেখতে পেলাম মূল দ্বীপ। গ্রামের বাড়িগুলোর চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। এমনকি সেখানকার গির্জার চূড়াটা পর্যন্ত দেখতে পেলাম। নিরাপত্তা, আশ্রয়, লোকালয়ের এত কাছে থাকা সত্ত্বেও ক্ষুধায় অসুস্থতায় মারা যাবো আমি?

তিন দিন কেটে গেছে। ক্রমশ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়ছি আমি। পাহাড়ে ওঠার শক্তিও লুপ্ত হয়ে গেছে। এর ভেতর আরো বার দুই কাঁচা ঝিনুক খাওয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। অবশেষে বসে পড়েছি সৈকতের ওপর। তাকিয়ে আছি সাগরের দিকে, কোনো নৌকা বা জাহাজ যদি যায়, আরোহীদের দৃষ্টি আকর্ষণের

চেষ্টা করবো।

এখন গ্রীষ্মের মাঝামাঝি। তবু বর্ষাকালের মতো চব্বিশ ঘণ্টার ওপর হয়ে গেল একটানা বৃষ্টি পড়ছে। একটু পরে হঠাৎ, প্রায় অপ্রত্যাশিতভাবে কমে এলো বৃষ্টি। তারপরই পরপর ঘটে গেল কয়েকটা ঘটনা।

দ্বীপের মাঝামাঝি জায়গায় উঁচু একটা পাহাড়। বৃষ্টি একটু কমতেই মেঘের অবস্থা কেমন দেখার জন্যে তাকালাম আকাশের দিকে। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ দেখে খুশি হয়ে উঠলো মন। এবার বোধহয় থামবে বৃষ্টি। আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে আনার সময় দেখতে পেলাম পাহাড়টার চূড়া। সঙ্গে সঙ্গে ধক করে উঠলো আমার হৃৎপিণ্ড। লাল একটা হরিণ দাঁড়িয়ে আছে চূড়ায় পিঠ ভর্তি শাদা শাদা ফোটা। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিলো হরিণও। নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল পাহাড়ের ওপাশে। ধারণা করলাম প্রণালী সাঁতরে মূল ভূখণ্ড থেকে এসেছে ওটা।

বৃষ্টি থেমে গেছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। আবার হামলা চালিয়েছে ভয়ঙ্কর ক্ষুধা। ঝিনুক খোঁজার জন্যে হাঁটাহাঁটি করছি সৈকতে, হঠাৎ চোখ পড়লো গোল চকচকে একটা জিনিসের ওপর। ঝুঁকে কুড়িয়ে নিতেই দেখলাম একটা গিনি। আবার চমকে ওঠার মতো অবস্থা আমার। গিনি এলো কোত্থেকে এই নির্জন দ্বীপে? নিশ্চয়ই হরিণ-টার মতো সাঁতরে নয়! তাহলে! পকেটে হাত দিলাম। এবার সত্যি সত্যিই চমকে উঠলাম। আমার থলেটা ক্যাপ্টেন নিয়ে নিয়েছিলো তাই খালাসীরা যে গিনিগুলো ফিরিয়ে দিয়েছিলো সেগুলো পকেটে রেখেছিলাম। এখন দেখলাম অ্যালানের বোতামটা ছাড়া আর কিছু নেই পকেটে। সব পড়ে গেছে। পকেটের ভেতর বড় সড় একটা গর্ত। কি করে হয়েছে জানি না। ভাগ্য ভালো অ্যালানের বোতামটা

পড়েনি। যাকগে এই নির্জন দ্বীপে টাকা দিয়ে কি হবে? ঈশ্বরের করুণাই এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন আমার। হাঁটু গেড়ে বসলাম প্রার্থনা করার জন্যে।

প্রার্থনা শেষ করে আবার হাঁটতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণের ভেতর আরো দুটো গিনি খুঁজে পেলাম সৈকতে। আরো দু'একটা পাওয়া যায় যদি, ভেবে হাঁটতে শুরু করবো আবার হঠাৎ করেই চোখ গেল সাগরের দিকে। একটা পাল নজরে পড়লো। এই দ্বীপের দিকেই এগিয়ে আসছে। ছোট একটা জেলে নৌকা। দু'জন লোক তাতে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো কলজেটা। গলায় যতটা জোর আছে সবটুকু দিয়ে চেঁচালাম। ওরা শুনতে পেলো আমার চিৎকার। তীরের আরো কাছে নিয়ে এলো নৌকা। দেখলো আমাকে। আমিও দেখলাম ওদের। ওদের চুলের রঙ পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পেলাম। একটু পরেই হো-হো করে হেসে উঠলো দু'জন। নৌকার মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল যেদিক থেকে এসেছিলো সেদিকে।

চরম হতাশায় ছেয়ে গেল আমার মন। পাগলের মতো চিৎকার করতে করতে দৌড়ালাম সৈকতের ওপর দিয়ে। কিন্তু ফিরলো না নৌকা। ধীরে ধীরে ছোট হতে হতে এক সময় হারিয়ে গেল একটা ডুবো পাহাড়ের আড়ালে। তখন যে আমার কি অনুভূতি হলো তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। দর দর করে পানি নেমে এলো দু'চোখ বেয়ে। কিছুতেই ঠেকাতে পারলাম না কান্না। শুয়ে পড়লাম মাটিতে। নড়াচড়ার শক্তিও যেন নেই শরীরে। পরদিন সকাল পর্যন্ত ওখানে, ওভাবেই পড়ে রইলাম।

পরদিন সকালে আবার এলো নৌকাটা। আজ আরোহী তিন জন। কালকের সেই দু'জন ছাড়াও রয়েছে নতুন একজন। আজও

কালকের মতো চিৎকার শুরু করলাম আমি। 'বাঁচাও! বাঁচাও! আমাকে নিয়ে যাও!' আজও তীরের একেবারে কাছে নিয়ে এলো ওরা নৌকা। দৌড়াতে দৌড়াতে সাগরে নেমে গেলাম আমি। হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগলাম প্রাণপণে। নৌকার তিন আরোহী-ই উঠে দাঁড়ালো। তিনজনই হাসলো হো-হো করে, যেন খুব একটা মজার জিনিস দেখছে। একটু পরে কালকের মতোই নৌকার মুখ ঘুরিয়ে দিলো ওরা। পানির ভেতর ঝাঁপাতে ঝাঁপাতে আরো কয়েক পা এগিয়ে গেলাম আমি। তৃতীয় লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো।

'জোয়ার! জোয়ার!' চিৎকার করলো সে। 'জোয়ার নেমে গেলে হেঁটে চলে যেও ওদিক দিয়ে।' হাত তুলে সেই খাঁড়িটার দিকে ইশারা করলো লোকটা।

মুহূর্তের ভেতর আমি বুঝে ফেললাম ব্যাপারটা। নৌকা জাহান্নামে যাক! প্রাণপণ শক্তিতে ছুটলাম সেই খাঁড়ির (আসলে প্রণালী) দিকে। বসে রইলাম পাড়ে।

অনেকক্ষণ পর। জোয়ার শেষ হয়ে ভাটা লাগতে শুরু করেছে। একটু একটু করে পানি নেমে যাচ্ছে। আবার আমি নামলাম সাগরে। আগের দিন যেখানে ডুবতে বসেছিলাম সেখানে এখন হাঁটু পানি। ধীরে ধীরে হেঁটে চললাম মূল দ্বীপের দিকে। নির্জন দ্বীপটা ভরা জোয়ারের সময়-ই শুধু আসল দ্বীপ হয়ে ওঠে। আমি গ্রামের ছেলে, এ সম্পর্কে কিছুই জানতাম না বলে এই দুর্গতিটা পোহাতে হলো।

কি বোকা আমি ওহ! জেলেরা আমার সমস্যাটা বুঝতে পারেনি, হয়তো চেষ্টাও করেনি। ওরা বোধহয় ধরে নিয়েছিলো আমি পাগল। তবু ভাগ্য ভালো, দ্বিতীয় দিন ওরা ফিরে এসেছিলো আমার অবস্থা দেখার জন্যে।

ষোলো

মুল আর নির্জন দ্বীপটার মাঝে যে প্রণালী তার সবচেয়ে সরু অংশ দিয়ে পার হচ্ছি আমি। ফলে কয়েক মিনিট মাত্র লাগলো মুল-এর তীরে পৌছুতে। প্রথমেই যে ব্যাপারটা আমার মনে দাগ কাটলো, নির্জন দ্বীপটার সঙ্গে বিশেষ পার্থক্য নেই এই দ্বীপের—অন্তত দ্বীপটার এ অংশের। কোনো রাস্তা নেই, বাড়িঘরও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু দূরে ধোঁয়ার রেখা দেখতে পাচ্ছি। অর্থাৎ ওখানে আগুন জ্বলছে, মানে মানুষ আছে। আর মানুষ থাকলে আশ্রয়ও নিশ্চয়ই আছে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম আমি। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দ্রুত হাঁটতে পারছি না। ভীষণ দুর্বল আর ক্ষুধার্ত লাগছে। তাছাড়া এলাকাটাও দুর্গম। উঁচু-নিচু, এবড়ো-খেবড়ো, পাথুরে পথ ধরে এগিয়ে যেতে হচ্ছে।

শেষ বিকেলে ছোট্ট একটা পাথরের বাড়ির কাছে পৌছুলাম। বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক বসে আছেন বাড়িটার সামনে। বিকেলের নরম রোদ পোহাতে পোহাতে পাইপ টানছেন। গেলিক (স্কটল্যাণ্ডের জাতীয় ভাষা) ভদ্রলোকের মাতৃভাষা। ইংরেজি যেটুকু জানেন তাকে জানার চেয়ে না জানা বলাই ভালো। অনেক কষ্টে তাঁকে বোঝাতে পারলাম আমি কি জানতে চাই। বৃদ্ধ যখন জবাব দিলেন তখন-ও

একই রকম কষ্ট করে বুঝতে হলো, তিনি কি বলছেন। তিনি যা বললেন তার মর্মার্থ হলো : কভেন্যান্ট-এর নাবিকরা নিরাপদে এই দ্বীপে এসে উঠেছে।

'ওদের ভেতর কি ভদ্রলোকের মতো পোশাক পরা কেউ ছিলো?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে তিনি যা জবাব দিলেন তার অর্থ হলো, বেশিরভাগ লোকই কমদামী লম্বা কোট পরা ছিলো। তবে প্রথম জন—যে একা এসেছিলো, তার পরনে ছিলো ব্রিচেস, ওয়েস্ট কোট, মোজা। অন্যদের গায়ে ছিলো সাধারণ নাবিকদের পাৎলুন।

'ঐ লোকটার—মানে যে একা এসেছিলো তার মাথায় কি পালক লাগানো টুপি ছিলো?'

'না, তোমার মতোই খালি মাথায় ছিলো সে-ও,' জবাব দিলেন ভদ্রলোক।

ভাবলাম অ্যালান হয়তো হারিয়ে ফেলেছিলো টুপিটা। তারপরই মনে পড়লো বৃষ্টির কথা। বৃষ্টির ভেতর নিশ্চয়ই ঐ দামী টুপি মাথায় দেয়নি অ্যালান। পোশাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে এমনিতেই যা খুঁতখুঁতে ও! নিশ্চয়ই লম্বা কোটের ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়েছিলো টুপিটা। হ্যাঁ, তা-ই সম্ভব। তার মানে বেঁচে আছে অ্যালান, এবং এ দ্বীপেই আছে।

'বুঝেছি!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। 'তুমি নিশ্চয়ই সেই রূপোর বোতামওয়ালা ছোকরা?'

'কেন, হ্যাঁ!' বিস্মিত কণ্ঠে বললাম আমি। পকেট থেকে বের করে দেখালাম বোতামটা।

গম্ভীর ভঙ্গিতে একটু মাথা ঝাঁকালেন ভদ্রলোক।

'তোমার জন্যে একটা খবর আছে,' বললেন তিনি। 'তোমার বন্ধু

বলে গেছে, তুমি যেন তার দেশে চলে যাও। জায়গাটা টরোসে-এর কাছে।'

এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমি কিভাবে এখানে পৌছুলাম। আমি খুলে বললাম আমার ঘটনা। অন্য কেউ হলে নির্ঘাত হেসে ফেলতো। কিন্তু ভদ্রলোক হাসলেন না। গম্ভীর মুখে সব শুনে শেষে দুঃখ প্রকাশ করলেন। তারপর আমার হাত ধরে নিয়ে গেলেন বাড়ির ভেতর। অদ্ভুত এক প্রশান্ত গাম্ভীর্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে, যেন আমি এক ডিউক, আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন মহামান্য রাণীর।

ভদ্রমহিলা-ও অত্যন্ত যত্নের সাথে গ্রহণ করলেন আমাকে। খাবার দিলেন, পানীয় দিলেন। আহ! কতদিন পরে এমন সুস্বাদু খাবার খেলাম! সাদাসিধে বাড়িটা ধোঁয়ায় ভর্তি, দেয়ালগুলোয় অসংখ্য গর্ত। কিন্তু আমার মনে হলো, রীতিমতো রাজপ্রাসাদে আছি!

বাবার মৃত্যুর পর থেকে আমার জীবনে যা যা ঘটেছে সব আমি শোনালাম বুড়ো-বুড়িকে। রুদ্ধশ্বাসে শুনলেন ওঁরা। তারপর উষ্ণ একটা বিছানা দিলেন শোয়ার জন্যে। পরদিন দুপুর পর্যন্ত মরার মতো ঘুমোলাম।

বেশ ঝরঝরে, চাঙা শরীর নিয়ে ঘুম থেকে জাগলাম। গলার ব্যথা প্রায় ভালো হয়ে গেছে। সামান্য যেটুকু আছে তাতে খুব একটা কষ্ট বোধ করছি না। এই চমৎকার বুড়ো-বুড়ির সহৃদয় আতিথেয়তা আমার মনে নতুন শক্তির সঞ্চার করেছে। সবচেয়ে বড় কথা অ্যালান বেঁচে আছে। ওকে খুঁজে বের করার জন্যে এক্ষুণি রওনা হতে হবে আমাকে।

রওনা হওয়ার আগে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলাম, থাকা আর

খাওয়া বাবদ কত দিতে হবে। ভীষণ ভাবে আপত্তি জানালেন ওঁরা টাকা পয়সা নিতে। অগত্যা শুধু ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিতে হলো। ধন্যবাদটা অবশ্য জানালাম আন্তরিক ভাবেই।

টরোসে-এর পথে হেঁটে চলেছি একা আমি। পথ জানা নেই। বৃদ্ধ যে পথের কথা বলে দিয়েছেন সেইপথে হেঁটে চলেছি। এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে পথ। হাঁটতে প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার যোগাড়। গরু-ভেড়ার পাল হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে রাখালরা। কিন্তু আশ্চর্য, একটা প্রাণীও স্বাস্থ্যবান নয়। না গরুগুলো, না ভেড়াগুলো না তাদের রাখালরা। অন্যান্য পথচারীদেরও একই রকম চেহারা। রোগা, দুর্বল। সবাই যেন ক্ষুধার্ত হয়ে আছে। তাদের পোশাক পুরনো, ছেঁড়া খোঁড়া। দুঃখ আর ক্ষুধারই যেন রাজত্ব দেশটায়।

এখানকার মানুষদের একমাত্র ভাষা গেলিক। ফলে পথ চেনা বেশ কষ্টকর হয়ে উঠলো আমার জন্যে। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করলে হাঁ করে চেয়ে থাকে। দু-একজন টরোসে শব্দটা বুঝতে পেরে ইশারায় দিক দেখিয়ে দিলো। ফলে বেশ কয়েকবার পথ হারালাম।

অবশেষে রাত আটটা নাগাদ ক্লান্ত বিধ্বস্ত অবস্থায় এক কুটিরের সামনে পৌঁছুলাম। ডাকাডাকি করে বাইরে আনলাম কুটিরওয়ালাকে। রাতের মতো আশ্রয় আর কিছু খাবার চাইলাম। হাতের ইশারায় সোজাসুজি লোকটা জানিয়ে দিলো, হবে না। একটু অনুরোধ উপরোধ করার চেষ্টা করলাম। এবারও ইশারায় জানালো, সে ইংরেজি বোঝে না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে একমুহূর্ত ভাবলাম। লোকটা ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ার জন্যে পা বাড়িয়েছে, এই সময় হাত ধরে থামালাম আমি ওকে। পকেট থেকে একটা গিনি বের করে

দেখালাম। ভোজবাজীর মতো কাজ হলো। এতক্ষণে ইশারায় জানাচ্ছিলো ইংরেজি বোঝে না কিন্তু গিনিটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে কথা বলে উঠলো সে। রাতের মতো আশ্রয় আর পরদিন পথ দেখিয়ে টরোসে-তে নিয়ে যেতে রাজি হলো, বিনিময়ে ওকে দিতে হবে পাঁচ শিলিং।

অস্বস্তিতে কাটলো রাতটা। ভালো ঘুমাতে পারলাম না। বার বার মনে হয়েছে, গিনি ক'টা মেয়ার জন্যে আমার ওপর হামলা আসবে হয়তো। আসলে অত দুশ্চিন্তা না করলেও চলতো। আমার আশ্রয়দাতা লোকটা ঠগবাজ, সম্ভবত দারিদ্র্যের কারণেই, তবে ডাকাত বা চোর নয়। ভোর বেলায় সে আমাকে নিয়ে গেল ঐ গ্রামের এক ধনী লোকের বাসায় গিনিটা ভাঙানোর জন্যে। পাঁচ শিলিং নগদ না পেলে সে কিছুতেই যেতে রাজি নয় আমার সাথে।

ধনী লোকটার বাড়ি দেখে আকাশ ভেঙে পড়লো মাথায়। এই যদি ধনী লোকের বাড়ি হয় তাহলে গরীবের বাড়ি কোন্‌টা? বাড়িটা অবশ্যই পাথরের তবে এমন জীর্ণ দশা যে মনে হয় এই বুঝি ভেঙে পড়লো ঘাড়ের ওপর। যা হোক ধনী ভদ্রলোক সারা বাড়ি তোলপাড় করে খুঁজেও বিশটা রূপার শিলিং-এর বেশি যোগাড় করতে পারলো না (এক গিনি-২১ শিলিং)। শেষে এক বুদ্ধি বের করলো লোকটা। বললো, ভাঙতি দেয়ার মূল্য হিশেবে সে এক শিলিং কেটে রাখবে। এই শর্তে যদি আমি রাজি থাকি তাহলে সে ভাঙিয়ে দেবে না হলে দেবে না। কি আর করা রাজি হতে হলো আমাকে।

এর পরই ধনী ভদ্রলোকের অতিথিপরায়ণতা চাগিয়ে উঠলো (আর যা-ই হোক নগদ একটা শিলিং পেয়েছে মুফতে)। দুপুরে না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়তে রাজি হলো না আমাদের। অনেক বলে কয়ে

আমি প্রায় রাজি করিয়ে ফেলেছিলাম, কিন্তু গড়বড় করে দিলো আমার পথ প্রদর্শক। ব্যাটা কিছুতেই যাবে না না খেয়ে।

খাওয়ার পর পরিবেশন করা হলো বড় এক চিনামাটির গামলা ভর্তি পাঞ্চ (গরম মসলা, লেবুর রস, চিনি, পানি আর সুরা মিশিয়ে তৈরি এক ধরনের পানীয়, যা পান করলে সহজেই মাতাল হয় মানুষ) আমার পথ প্রদর্শক মগ হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লো গামলার ওপর। গৃহস্বামী মিস্টার হেক্টর ম্যাকলিন-ও। তার পরিবারের দু'একজন সদস্যও যোগ দিলো। অসহায় ভাবে দেখা ছাড়া আর কিছু করতে পারলাম না আমি। কিছুক্ষণের ভেতর বদ্ধ মাতাল হয়ে গেল দু'জন। মিস্টার ম্যাকলিন ঘোষণা করে দিলো, গামলা খালি না করে যদি ওঠে অতিথিরা তাহলে ভীষণ অপমানিত বোধ করবে সে। একটু পরে হেঁড়ে গলায় গান ধরলো সবাই। কান ঝালাপালা অবস্থা আমার। কিন্তু উঠতে পারছি না জায়গা ছেড়ে, পাছে অপমান হয় গৃহস্বামীর আর বেঁধে রেখে দেয় আমাকে।

গভীর রাতে শেষ হলো তাদের পানোৎসব। এক এক করে সবাই গিয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায় অথবা গোলাঘরে। পথপ্রদর্শকের সঙ্গে আমি ফিরে এলাম তার বাড়িতে।

পর দিন ভোরে, ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী পাঁচটায়, উঠে পড়লাম আমরা। কিন্তু আমার অপদার্থ পথপ্রদর্শক তক্ষুণি বসে গেল মদের বোতল নিয়ে। তিন ঘণ্টার আগে আর তাকে ওঠানো গেল না সেখান থেকে। অবশেষে রওনা হলাম আমরা।

ঝোপ-ঝাড়ে ছাওয়া এক উপত্যকা পর্যন্ত ভালোই এগোলাম (এখনো মিস্টার ম্যাকলিনের বাড়ি পর্যন্ত যাইনি আমরা)। আমার পথপ্রদর্শক বার বার ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকানো ছাড়া আর কিছু

করেনি এতক্ষণ। একটু পরে, পাহাড়ের পেছন দিকটায় পৌঁছানো মাত্র থেমে দাঁড়ালো সে। বললো, নাক বরাবর এগিয়ে গেলেই আমি পৌঁছে যাবো টরোসেয়।

'তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না,' বললাম আমি। 'তুমি তো থাকছোই সঙ্গে।'

গেলিক-এ জবাব দিলো নির্লজ্জ লোকটা, বোঝাতে চাইলো সে ইংরেজী জানে না।

'বাবা,' বললাম আমি, 'আমি জানি তোমার ইংরেজি এই আসে এই যায়। এখন বলো তো, কি হলে আবার আসবে? আরো কিছু টাকা?'

'পাঁচ শিলিং হলেই চলবে।'

এক মুহূর্ত ভাবলাম আমি। 'দুই শিলিং। রাজি?'

লোভে চকচক করে উঠলো তার চোখ। সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিলো ভিক্ষুকের মতো। দুটো শিলিং দিলাম আমি তাকে। তারপর রওনা হলাম আবার।

দু'মাইল-ও যেতে পারিনি, আবার দাঁড়িয়ে পড়লো লোকটা। মাটিতে বসে জুতো খুলে ফেললো পা থেকে।

রাগে লাল হয়ে উঠলো আমার মুখ। 'কি, আবার শেষ হয়ে গেল তোমার ইংরেজি?'

'হ্যাঁ,' নির্লজ্জের মতো হেসে জবাব দিলো সে।

গা জ্বলে উঠলো আমার। এক লাফে ছুটে গেলাম লোকটার টুঁটি চেপে ধরার জন্যে। তৈরিই ছিলো যেন সে। লাফিয়ে উঠে পিছিয়ে গেল এক পা। ইতিমধ্যে ছেঁড়া কাপড়ের ভেতর থেকে বের করে ফেলেছে একটা ছুরি। হিংস্র দাঁত বের করা হাসি মুখে।

আরো ক্ষেপে উঠলাম আমি। সাবধানে লোকটার চোখে চোখ রেখে ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার ওপর। বয়সের তুলনায় একটু বেশিই জোর আমার গায়ে। আর ও অনাহার অর্ধাহারে দুর্বল, দেহের গড়নও ছোট খাটো। কিছুই করতে পারলো না লোকটা। এক ঘুসি খেয়ে পড়ে গেল চিৎ হয়ে। হাত থেকে ছুটে গেল ছুরিটা।

ছুরি আর ওর জুতো জোড়া তুলে নিয়ে রওনা হলাম আমি। উৎফুল্ল গলায় বললাম, 'আসি তাহলে, কেমন ?' এই পাথুরে পথ ধরে খালি পায়ে বাড়ি পর্যন্ত যেতে আক্কেল হয়ে যাবে ব্যাটার। কিছুদুর এসে জুতো জোড়া ছুঁড়ে ফেলে দিলাম পথের পাশে।

আধ ঘণ্টা পর বিশাল দেহী, ছেঁড়া পোশাক পরা এক লোককে দেখলাম পথে। বেশ দ্রুত হাঁটছে। কাছে পৌছে দেখলাম লাঠি ঠুকে ঠুকে পথ ঠাহর করছে সে। অন্ধ নিশ্চয়ই। কিছুক্ষণ হাঁটলাম তার পাশাপাশি। হঠাৎ দেখলাম তার কোটের পকেটের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে ইস্পাতের একটা পিস্তলের বাঁট। এমন একজন অন্ধ লোকের পিস্তল কি কাজে লাগে ভেবে পেলাম না।

এগিয়ে গিয়ে আলাপ করলাম লোকটার সাথে। আমার পথপ্রদর্শক সম্পর্কে বললাম। বেশ গর্বের সাথেই বললাম, শেষ পর্যন্ত তার দশা আমি কি করেছি। তাকে পাঁচ শিলিং দিয়েছি শুনে এমন জোরে চেঁচিয়ে উঠলো লোকটা যে আমি ঠিক করে ফেললাম, বাকি দুই শিলিং-এর কথা উচ্চারণও করবো না। ভাগ্য ভালো লোকটা অন্ধ না হলে আমার লাল হয়ে যাওয়া গাল দেখে বেশ মজা পেতো।

'খুব বেশি দিয়ে ফেলেছি ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'বেশি মানে! এক পাত্র ব্র্যাণ্ডি খাইও আমি নিজে তোমাকে পৌছে দেবো টরোসে-তে।

'আপনি অন্ধ, কি করে আমাকে পথ দেখাবেন ?'

'শোনো হে ছোকরা, আর কোনো জায়গায় না হোক, অন্তত মুল দ্বীপের প্রতিটা পাথর, প্রতিটা ঝোপ আমার চেনা। চলো আমার সাথে, গেলেই বুঝতে পারবে।'

অন্ধ ভদ্রলোকের সাথে চলতে লাগলাম আমি।

সতেরো

টরোসে থেকে মূল ভূখণ্ডের কিনলোচ্যালিন পর্যন্ত নিয়মিত চলাচল করে একটা খেয়াজাহাজ। দুই উপকূলেরই বেশির ভাগ লোক ম্যাকলিন গোত্রের। খেয়ায় যারা পারাপার হয় তাদেরও সবাই ঐ গোত্রের মানুষ। খেয়া জাহাজটার ক্যাপ্টেনের নাম নিল রয় ম্যাকরব। অ্যালানদের গোত্রের একটা উপগোত্র হলো ম্যাকরব। কথাটা জানা ছিলো আমার। তাই খেয়ায় ওঠার পর যখন শুনলাম ক্যাপ্টেনের নাম ম্যাকরব তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, একা একা ভদ্রলোকের সাথে একটু আলাপ করবো। 'অ্যালান সম্পর্কে কিছু হয়তো বলতে পারবেন উনি,' ভাবলাম মনে মনে। অপেক্ষা করতে লাগলাম, কখন তাঁকে একা পাই।

লোকে গিজ গিজ করছে খেয়া। এগোচ্ছে খুব ধীর গতিতে। বাতাস নেই তেমন ফলে পাল খুব একটা কাজে আসছে না। যাত্রীদের অনেকেই সাহায্য করছে দাঁড় টানায়।

সূর্য উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে। সাগরে তার রশ্মি পড়ে ঝিকমিকিয়ে উঠছে। বাতাস একেবারে তাজা, নির্মল। আমাদের মন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে এমন আবহাওয়ায়। কেউ কেউ গান ধরেছে। কিছু-

ক্ষণের ভেতর বেশির ভাগ যাত্রী-ই গলা মেলালো তাদের সাথে।

প্রণালীর মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছেছি আমরা। করুণ একটা দৃশ্য চোখে পড়লো এই সময়। বিরাট একটা জাহাজ এগিয়ে আসছে কিনলোচ্যালিন-এর দিক থেকে। মানুষের ভীড়ে কালো হয়ে আছে তার ডেকগুলো। দূর থেকেই শুনতে পেলাম মানুষের আহাজারি। নিকট আত্মীয় কেউ মরে গেলে লোকে যেমন করে বিলাপ করে ঠিক তেমন বিলাপ করছে জাহাজের যাত্রীরা। ব্যাপার কি বুঝতে পারলাম না প্রথমে।

ধীরে ধীরে কাছাকাছি হলো খেয়া আর জাহাজ। এবার বুঝলাম আহাজারির কারণ। দেশান্তরীদের বহন করছে জাহাজটা। দেশের দরিদ্র জনসাধারণ ভাগ্যের সন্ধানে চলেছে আমেরিকায়। চোখে রঙিন স্বপ্ন। তাই বলে কি জন্মভূমি ছেড়ে যাওয়ার বেদনা ভোলা যায়?

জাহাজটার একেবারে কাছে নিয়ে গেলাম আমরা খেয়া। দেশত্যাগীদের অনেকে ঝুঁকে এলো রেলিং-এর ওপর। খেয়ায় তাদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের সাথে শেষবারের মতো হাত মিলানোর জন্যে বাড়িয়ে দিলো হাত। করুণ একটা দৃশ্য। অনেকেরই চোখের কোনায় টলমল করছে জল।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল জাহাজটা। ক্রমে বাড়ছে খেয়ার সাথে দূরত্ব। হঠাৎ করুণ সুরে, একটা বিদায় সঙ্গীত গেয়ে উঠলো আমাদের একজন। এক সেকেণ্ড পরেই তার সাথে গলা মিলালো আরেকজন। তারপর আরেকজন। একটু পরেই দেখলাম খেয়ার প্রায় সবাই গাইছে। জাহাজ থেকেও ভেসে আসছে একই গানের সুর। উপকূলে যারা ছিলো তারা শুনতে পেলো সম্মিলিত কণ্ঠের এই গান। তারাও গলা মেলালো আমাদের সঙ্গে। সবাই কাঁদছে।

একসময় দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল জাহাজটা। কিন্তু গান থামলো না।

অবশেষে কিনলোচ্যালিন-এ পৌঁছুলো খেয়া। গান থেমে গেল। আরোহীরা ব্যস্ত হয়ে উঠলো নামার জন্যে। আমি এগিয়ে গেলাম ক্যাপ্টেনের কাছে।

খেয়ার শেষ লোকটা না নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। তারপর সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি অ্যালান ব্রেককে খুঁজছি, অ্যালান ব্রেক স্টুয়ার্ট। ওর কোনো খবর দিতে পারবেন আপনি?' পকেট থেকে একটা শিলিং বের করে এগিয়ে দিলাম তাঁর দিকে।

শিলিংটা দেখে ভদ্রলোকের চেহারা যা হলো সে দেখার মতো। কটমটিয়ে চাইলেন আমার চোখে চোখে।

'ভদ্রলোকের সাথে এমন ব্যবহার! কোথায় শিখেছো?' কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

একটা ঢোক গিলে তাড়াতাড়ি এবার রূপোর বোতামটা বের করলাম। ওটা দেখে একটু যেন নরম হলো মিস্টার নিল রয়-এর চাউনি।

'প্রথমে কেন দেখাওনি ওটা, অ্যাঁ?' ঝাঁঝিয়ে উঠলেন তিনি। 'তার মানে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, তুমিই সেই রূপোর বোতামওয়ালা ছোকরা, নাকি?'

'জি।'

'বেশ তোমাকে সাহায্য করবো আমি। সে রকমই নির্দেশ আছে আমার ওপর। কিন্তু একটা ব্যাপার গোড়াতেই পষ্টাপষ্টি জানিয়ে দিই, অ্যালান ব্রেকের নাম উচ্চারণ করো না কারো সামনে। আর তোমার এ নোংরা পয়সাও সেধো না কোনো ভদ্রলোককে। আমরা এ এলাকার মানুষরা আর যা-ই হই ভিক্ষুক নই।'

অ্যালানের মতো ক্যাপ্টেন নিল-ও গরীব কিন্তু খুবই আত্মসম্মানী।

ক্ষমা চাওয়ার কথা ভাবলাম ভদ্রলোকের কাছে। কিন্তু ব্যাপারটা খুব সহজ হলো না আমার পক্ষে। যা-হোক আমার সঙ্গে খুব বেশিক্ষণ আলাপে উৎসাহী হলেন না উনি—হয়তো শুরুতেই চটিয়ে দিয়েছি বলে। পকেট থেকে ছোট এক টুকরো কাগজ বের করে এগিয়ে দিলেন আমার দিকে।

'এই চিরকুটটা তোমাকে দিতে বলে গেছে অ্যালান,' গলা খাদে নামিয়ে বললেন তিনি।

আমি অবাক হলাম একটু। হাত বাড়িয়ে নিলাম কাগজটা। তাতে লেখা :

'কিনলোচ্যালিন-এর সরাইখানায় রাতটা কাটিয়ে সকালে রওনা হবে আমার বাড়ি অ্যাপিন এর পথে। অ্যাপিন-এ পৌঁছে সোজা অচার্ন এ চলে যাবে। আমার চাচাতো ভাই জেমস্ স্টুয়ার্টকে পাবে সেখানে। ও তোমাকে সাহায্য করবে।'

এরপর আমাকে কিছু উপদেশ দিলেন ক্যাপ্টেন।

'সব সময় ক্যাম্পবেলদের থেকে দূরে থাকবে,' বললেন তিনি। 'লাল কোর্তাদের কাছ থেকেও। হঠাৎ যদি কখনো ওদের সামনে পড়ে যাও পথ ছেড়ে ঝোপে লুকিয়ে পড়বে।' মোট কথা, একজন জ্যাকবাইটের ক্যাম্পবেল বা লাল কোর্তাদের দেখে যেমন আচরণ করা উচিত আমাকেও তেমন করতে বিশেষ ভাবে শিখিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন লিন রয়।

নিশ্চয়ই আমাকে জ্যাকবাইট ধরে নিয়েছেন ভদ্রলোক।

উপদেশে কান বোঝাই করে সরাইখানায় গেলাম আমি। জঘন্য একটা জায়গা। ধোঁয়ায় ভর্তি। বিছানায় ছারপোকার রাজত্ব। অবশ্য

তাতে খুব একটা অসুবিধা হলো না। পথশ্রমে বেশ ক্লান্ত আমি, শোয়ার সাথে সাথে তলিয়ে গেলাম ঘুমের অতলে।

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠলাম। কয়েক মিনিটের ভেতর তৈরি হয়ে নেমে এলাম পথে।

কিছুক্ষণ পর ছোট-খাটো অথচ শক্তপোক্ত নিঃসঙ্গ এক লোকের কাছাকাছি পৌঁছুলাম আমি। সাদাসিধে অথচ সুন্দর পোশাক পরে আছেন। ধীর পায়ে হেঁটে চলেছেন তিনি। গভীর মনোযোগের সাথে একটা বই পড়ছেন। একটু পর পরই বই থেকে চোখ তুলে পথ দেখে নিচ্ছেন। অবাক হলাম আমি। বাহ, ভালো লোক তো! পথ চলছে বই পড়তে পড়তে! পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় একটু ঝুঁকে দেখলাম, বইটা বাইবেল। কি মনে হতে এগিয়ে না গিয়ে ভদ্রলোকের পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম আমি।

একটু পরেই তিনি মুখ তুলে তাকালেন। এবার আর পথের দিকে নয়, আমার দিকে তাঁর চোখ।

'কি, হে, কোথায় যাচ্ছো?' জিজ্ঞেস করলেন, যেন কতদিন ধরে চেনেন আমাকে।

'অ্যাপিন-এ,' জবাব দিলাম আমি।

'আসছো কোত্থেকে?'

ভাবনায় পড়ে গেলাম। কি বলবো ঠিক বুঝতে পারছি না।

'কোত্থেকে আসছো?' আবার জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'আসলে রওনা হয়েছিলাম এসেনডিন থেকে,' একটু ইতস্তত করে জবাব দিলাম। 'আপাতত আসছি মুল থেকে।'

পরিষ্কার বিস্ময় ফুটে উঠতে দেখলাম লোকটার চোখে।

'এসেনডিন থেকে!'

"'হ্যাঁ,' আর কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ তাঁকে দিলাম না ; আমিই জিজ্ঞেস করলাম . 'কিন্তু, আপনি কে ? বাইবেল পড়তে পড়তে চলছেন কোথায় ?'

জবাবে ভদ্রলোক জানালেন তার নাম হেণ্ডারল্যাণ্ড। এখানকার রাজপ্রতিনিধি, গির্জার পুরোহিত-ও। গ্রামের মানুষদের ধর্মের কথা শোনানোর জন্যে বেরিয়েছেন এই সাত সকালে।

কিছুক্ষণ আলাপ করেই বুঝলাম ভদ্রলোক বেশ জ্ঞানী, প্রচুর পড়াশোনা। পথচারীদের সবাই বিশেষ ভাবে সম্মান দেখাচ্ছে তাঁকে। কেন জানি না তাঁর বেশ পছন্দ হলো আমাকে। তাঁর কাজের ধারা সম্পর্কে জ্যাকবাইটদের সম্পর্কে অনেক কিছু বললেন। কিছুক্ষণের ভেতর বুঝে ফেললাম তিনি জ্যাকবাইট নন কিন্তু তাঁদের বিরোধী-ও নন। এটা বুঝতে পারার পর তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম অ্যাপিন-এর কৃষকদের সম্পর্কে। তাদের সঙ্গে লাল শেয়ালের বিরোধের বিষয়ে-ও জানতে চাইলাম।

'ব্যাপারটা কেমন আশ্চর্য তাই না ?' বললেন তিনি। 'নিজেরাই খেতে পায় না, অথচ দ্বিতীয় একটা কর দেয় আর্ডশিয়েলকে। কেন ? বলো, মিস্টার ব্যালফোর, (ইতিমধ্যে এক ফাঁকে আমার নাম জেনে নিয়েছেন মিস্টার হেণ্ডারল্যাণ্ড)?'

কাঁধ ঝাঁকালাম আমি।

এই আর্ডশিয়েল লোকটার ভীষণ প্রভাব প্রজাদের ভেতর। আর কিছু নয়, দেশে থাকতে প্রজাদের ভালো মন্দের খোঁজখবর রাখতো, তাতেই এতটা অর্জন করেছে ও।' হঠাৎ চুপ করে গেলেন ভদ্রলোক। একটু পরে বললেন, 'যত যা-ই বলি, ব্যাপারটা আসলে দুঃখজনক। গোত্রপ্রধানকে কর দিতে গিয়ে ক্ষুধার্ত থাকতে হচ্ছে প্রজাদের। অন্য-

দিকে লাল শেয়াল আসছে তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করতে। অবশ্যই সরকার আছে ওর পেছনে। ওর কথা হলো, দেশের জন্যে বিপদজনক ঘোষণা করা হয়েছে এমন লোককে কর দিয়ে নিশ্চয়ই অপরাধ করেছে কৃষকরা। তাদের শাস্তি হওয়া উচিত। আইনত ঠিক কথা-ই বলছে ও।' আবার থামলেন মিস্টার হেণ্ডারল্যাণ্ড। তারপর, 'আমি জ্যাকবাইট নই,' গলার স্বর গাঢ় হয়ে উঠেছে তাঁর। 'তবু এইসব চাষীদের প্রশংসা না করে পারি না। আর্ডশিয়েলকে সত্যিই ভালোবাসে ওরা। আত্মত্যাগের একটা ব্যাপার আছে এর ভেতর।'

'লাল শেয়াল কি সত্যি সত্যিই ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করবে চাষীদের?' আমার প্রশ্ন।

'কাল আসার কথা ওর। সঙ্গে থাকবে লাল-কোর্তা বাহিনী। আমার ধারণা ঝামেলা হবে। বুঝলে হে, ঝামেলা হবে, মস্ত ঝামেলা। অ্যাপিনের স্টুয়ার্টরা ভীষণ হিংস্র। ওরা খুন করবে ওকে। কোনো সন্দেহ নেই আমার।'

কথা বলতে বলতে লিনহে লক-এ পৌঁছুলাম আমরা। মিস্টার হেণ্ডারল্যাণ্ডের অনুরোধে তাঁর বাড়িতেই কাটালাম রাতটা। পরদিন সকালে এক জেলের সঙ্গে কাথাবার্তা পাকা করে ফেললেন তিনি, নৌকায় করে হ্রদের ওপারে অ্যাপিন-এ পৌঁছে দেবে আমাকে।

আঠারো

দুপুরের একটু আগে রওনা হলাম আমরা অ্যাপিন-এর পথে। আকাশ মেঘলা। তবে একটু পরপরই মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে সূর্য। সে সময়টায় ঝিকমিকিয়ে উঠছে হ্রদের পানি। দুপাশে উঁচু পাহাড়ের সারি। নির্জন। যখন সূর্য থাকছে না তখন কেমন বিষণ্ন আর অন্ধকার। আর সূর্য উঠলেই হয়ে উঠছে রূপালী উজ্জ্বল।

রওনা হওয়ার একটু পরেই উত্তর দিকে জলের ঠিক কিনারে লাল কিছুর ওপর পড়লো সূর্যকিরণ। লালের মাঝে দু'এক জায়গায় ঝিক করে উঠলো রূপালী আলো। একবার দেখেই বুঝতে পারলাম, কি ওগুলো। রাজকীয় সেনাবাহিনীর সদস্য। লাল পোশাক পরা লাল-কোর্তা! সূর্যের আলোয় ঝকমকিয়ে উঠছে তাদের চকচকে রূপালী শিরোস্ত্রাণ, তরবারি।

আমার মাঝিকে জিজ্ঞেস করলাম, কি ওগুলো। মাঝি-ও বললো, ওগুলো লাল-কোর্তাই হবে। ফোর্ট উইলিয়াম থেকে অ্যাপিন-এর দিকে যাচ্ছে, সম্ভবত হতভাগ্য কৃষকদের শায়েস্তা করার জন্যে।

দৃশ্যটা দুঃখভারাক্রান্ত করে তুললো আমাকে। আমি জ্যাকবাইট নই, তবু কখন যে এই দরিদ্র কৃষকদের আপন ভাবতে শুরু করেছি

নিজেও টের পাইনি।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল নৌকা অ্যাপিন-এর দিকে। মাঝি ব্যালাচুলিশ নামক এক ঘাটে নামিয়ে দিতে চাইলো আমাকে। কিন্তু আমি চাইলাম আর একটু এপাশে নামতে। ব্যালাচুলিশ-এ নামলে আমার গোপন গন্তব্যে পৌঁছানো কষ্টসাধ্য হবে। শেষ পর্যন্ত আমার পীড়াপীড়িতে অ্যাপিন-এর লেটারমোর (বা লেটারভোর, দুভাবেই নামটা উচ্চারণ করতে শুনেছি আমি) নামক জায়গায় আমাকে নামিয়ে দিলো মাঝি।

জায়গাটা জংলা। খাড়া একটা পাহাড়ের ঢালে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে প্রচুর বার্চগাছ। তার মাঝখান দিয়ে অচার্ন-এর দিকে চলে গেছে পাহাড়ী একটা পথ। পথের পাশে কিছু দূরে একটা ঝর্ণা। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম আমি ঝর্ণাটার কাছে। বসলাম। মিস্টার হেণ্ডারল্যাণ্ডের দেয়া ওটের রুটি বের করলাম পুটুলি থেকে।

খাওয়া শুরু করতেই একরাশ চিন্তা এসে হানা দিলো মাথায়। অ্যালানের কাছে যাচ্ছি, কিন্তু ব্যাপারটা কি ঠিক হচ্ছে? আইনের বাইরের লোক ও। হয়তো খুনোখুনীতে-ও জড়িয়ে পড়বে। সেক্ষেত্রে ওর কাছ থেকে শত হাত দূরে থাকাই আমার জন্যে মঙ্গলজনক নয় কি? কি করবো আমি? যাবো অ্যালানের কাছে? না ফিরে যাবো দক্ষিণে নিজের দেশে? মিস্টার হেণ্ডারল্যাণ্ডের কথা মনে পড়লো, 'অ্যাপিনের স্টুয়ার্টরা ভীষণ হিংস্র,' তাঁর কথা অবিশ্বাস করার কোনো কারণ দেখিনি আমি।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে খাওয়া শেষ করলাম। হঠাৎ ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠলাম আমি। মানুষের চেঁচামেচির শব্দও পাওয়া যাচ্ছে। ঝট করে মুখ তুলে তাকালাম রাস্তার দিকে। চারজন

মানুষকে দেখলাম। এদিকেই আসছে। পথ দুর্গম আর সরু বলে একজনের পর একজন লাগাম ধরে ঘোড়াগুলোকে হাঁটিয়ে আনছে।

একেবারে সামনের লোকটা বিশালদেহী। চুলগুলো লাল। দ্বিতীয় জনের পরনে কালো পোশাক, মাথায় শাদা পরচুলা। চেহারাই বলে দিচ্ছে লোকটা আইনজীবী। তৃতীয় জনের পোশাক ভৃত্যের মতো। আর চতুর্থজন শেরিফ।

বিশালদেহী লালচুলো লোকটার দিকে এগিয়ে গেলাম।

'অচার্ন-এ যাওয়ার পথ কোন্‌টা দয়া করে বলবেন, স্যার?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

লোকটার উদ্ধত লাল মুখটা খেয়াল করলাম এতক্ষণে। ধূর্ত চাউনি চোখে। লাল চুল তো আগেই দেখেছি। এই কি সেই বিখ্যাত লাল শেয়াল? প্রশ্নটা জাগলো মনে, কিন্তু কোনো সদুত্তর পেলাম না।

'অচার্ন?' উল্টো প্রশ্ন করলো লোকটা। 'অচার্ন-এ কেন যাচ্ছো তুমি?'

আইনজীবী এসে দাঁড়ালো তার পাশে। অন্য দু'জন রইলো একটু দূরে। পাথরের মূর্তির মতো অনড়। জবাব দেয়ার জন্যে সবে মুখ খুলেছি, এমন সময় একটা গুলির শব্দ। তীব্র একটা আর্তনাদ বেরোলো লাল চুলওয়ালা বিশালদেহীর গলা চিরে। পর মুহূর্তে হাত-পা ছড়িয়ে কাটা গাছের মতো চিৎ হয়ে পড়ে গেল সে।

'গ্লেনিউর!' চেঁচিয়ে উঠে হাঁটু গেড়ে বসলো আইনজীবী। ঝুঁকে পড়ে বিশালদেহীর মাথাটা তুলে নিলো কোলের ওপর।

'গ্লেনিউর!' আবার চিৎকার করলো সে। 'কি হলো গ্লেনিউর!

'গ্লেনিউর! গ্লেনিউর-এর কলিন রয় ক্যাম্পবেল। তার মানে সত্যিই লোকটা লাল শেয়াল! অবাক চোখে তাকালাম আমি তার দিকে।

'ওহ! ওরা আমাকে খুন করলো, মুঙ্গো!' কোনো রকমে উচ্চারণ

করলো লাল-শেয়াল। মাথাটা তার হেলে পড়লো পেছন দিকে। চমকে ওঠার মতো করে কেঁপে উঠলো শরীর। তারপর স্থির হয়ে গেল।

আস্তে কোল থেকে মাথাটা নামিয়ে রেখে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো আইনজীবী। নির্বাক। মুখটা শাদা হয়ে গেছে ছাই এর মতো। চোখ দুটো এখনো স্থির লাল-শেয়ালের মুখের ওপর। শিশুর মতো ডুকরে কেঁদে উঠলো ভৃত্য। আমি আতঙ্কে শিউরে উঠলাম শুধু।

শেরিফ দৌড়ে গেছে তার সৈনিকদের ডেকে আনার জন্যে। এক্ষুণি এসে পড়বে ওরা। পাহাড়ের দিকে তাকালাম আমি। দূরে একটা লোককে দেখতে পেলাম। এ-ও বিশালদেহী। কালো কোট পরনে। ঝোপ-ঝাড় আর পাথরের আড়ালে আড়ালে ছুটে যাচ্ছে। হাতে বন্দুক। নিঃসন্দেহে ও-ই খুন করেছে লাল শেয়ালকে। এখন প্রাণ নিয়েপালাতে ব্যস্ত।

তড়াক করে উঠে দাঁড়ালাম আমি। চিৎকার করে বললাম, 'ঐ তো খুনী! ঐ তো পালাচ্ছে।' তারপরই ছুটলাম আমি লোকটাকে ধরার জন্যে।

'থামো!' বজ্রকঠিন গলায় রাস্তা থেকে ভেসে এলো একটা আদেশ। 'থামো এক্ষুণি!'

দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম। আইনজীবী হাতের ইশারায় ডাকছে আমাকে। শেরিফ কয়েকজন সৈনিক নিয়ে ফিরে এসেছে। সে-ও হাত তুলেছে আমাকে থামতে বলার জন্যে।

ওরা আমাকে ফিরে যেতে বলছে, খুনীর পেছনে ছুটতে বারণ করছে। কেন?

'আপনারা এদিকে আসুন,' পাল্টা চিৎকার করলাম আমি। 'ঐ

তো ওখানে খুনী। আমি দেখেছি। আর দেরি করলে, পালাবে।'

আমার কথা গ্রাহ্য করলো না কেউ। আইনজীবীর চিৎকার শুনতে পেলাম, 'যে ঐ ছোকরাকে ধরে দিতে পারবে দশ পাউণ্ড দেবো তাকে। ও-ও আছে ষড়যন্ত্রে। আমাদের এখানে থামানোর জন্যেই ওকে পাঠিয়েছে বদমাশগুলো!'

সর্বনাশ! ওরা ভেবেছে খুনীকে সাহায্য করার জন্যে আমি এসেছি! ভয়ানক এক ভয়ের স্রোত নেমে এলো আমার শরীর বেয়ে। নড়তে পারলাম না আমি। হাত-পা জমে গেছে যেন। ভাবতে পর্যন্ত পারছি না কিছু। দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে, অসহায়ের মতো।

দশ পাউণ্ড পুরস্কারের কথা শোনামাত্র নড়ে উঠেছে সৈনিকরা। দ্রুত পাথর টপকে টপকে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে চারদিক থেকে। কিন্তু আমি, এখনো দাঁড়িয়ে আছি পাথরের মতো। কি করবো কিছু বুঝতে পারছি না।

'জলদি!' হঠাৎ একটা গলা ভেসে এলো ও পাশের একটা ঝোপের পেছন থেকে। 'এই যে, এদিকে। ছুটে এসো।'

মুহূর্তে সচল হয়ে উঠলো আমার মস্তিষ্ক। কি করতে হবে বুঝে ফেলেছি। কে ডেকেছে তা-ও বুঝতে পেরেছি। সৈনিকদের দিকে তাকালাম একবার ঘাড় ঘুরিয়ে। তিন দিক থেকে ঘিরে ধরেছে ওরা আমাকে। বাকি আছে একটা দিক সেদিক থেকেই এসেছে আহবান। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ছুটলাম ঝোপটার দিকে।

এক নিঃশ্বাসে পৌঁছুলাম ঝোপের পেছনে। অ্যালান ব্রেক দাঁড়িয়ে সেখানে। হাতে একটা মাছ ধরা ছিপ।

'আমার সঙ্গে এসো।' ব্যস্ত কণ্ঠে বলেই ছুটলো ও পাহাড়ের কোল

ঘেঁষে।

আমিও পাহাড়ী ভেড়ার মতো লাফাতে লাফাতে চললাম ওর পেছন পেছন।

উহ! কি দৌড়ানোটাই না দৌড়ালাম। কখনো গাছের ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে এঁকে বেঁকে, কখনো ছোট ছোট পথরের চাঁই-এর ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে, কখনো ঝোপের ভেতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে ছুটে চললাম আমরা। এত জোরে যে মনে হচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা ফেটে যাবে এক্ষুণি।

কুঁজো হয়ে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ একেকবার সোজা হয়ে পেছন ফিরে তাকাচ্ছে অ্যালান। সাথে সাথে পেছন থেকে ভেসে আসছে সৈনিকদের সম্মিলিত চিৎকার, 'ঐ যে ওখানে।'

প্রায় সিকি ঘণ্টা পর একটা ঝোপের আড়ালে থামলো অ্যালান। সটান শুয়ে পড়লো মাটিতে। তারপর ফিরলো আমার দিকে।

'এবার,' ফিস ফিস করে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো ও, 'ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ, ডেভিড, প্রাণে বাঁচতে চাইলে আমি যা করি তাই করো।'

বলেই উঠে দাঁড়ালো অ্যালান। ঝট করে একবার ঘাড় ফিরিয়ে চাইলো পেছনে শত্রুর দিকে, তারপর ছুটলো আবার। তবে এবার অনেক সাবধানে, মাথা নিচু করে, যেন পেছন থেকে দেখতে না পায় ওরা। আমিও ছুটলাম পেছন পেছন।

আগের মতোই প্রাণপণে, পাহাড়ের পাশে পাশে দৌড়ে যেখান থেকে রওনা হয়েছিলাম প্রায় সেখানে ফিরে এলাম আমরা। এবার একটু উপরে উঠে এসেছি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে, না হলে বলা যেতো, ঠিক সেখানেই ফিরে এসেছি। হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লো

অ্যালান। কুকুরের মতো হাঁপাচ্ছে সে। আমিও। গলার কাছটা শুকিয়ে কাঠ। প্রচণ্ড তৃষ্ণা বুক জুড়ে। মনে হচ্ছে জিভ বের হয়ে আসবে। অ্যালানের পাশে শুয়ে পড়লাম আমিও।

উনিশ

অ্যালানই প্রথমে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো ও। একদম হাঁপাচ্ছে না। আমার দিকে একবার তাকিয়ে চলে গেল বনের প্রান্তে। সাবধানে ঘুরে ঘুরে দেখলো। তারপর ফিরে এলো।

'বড় বাঁচা বেঁচে গেছি আজ, ডেভিড!'

কিছু বললাম না আমি। মুখও তুললাম না মাটি থেকে। আমার সামনেই খুন হয়েছে লোকটা। প্রাণবান বিশাল একটা মানুষ নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। ঘটনার আকস্মিকতা এখনো বিহ্বল করে রেখেছে আমাকে। এমন একটা মানুষ খুন হয়েছে যাকে ঘৃণা করে অ্যালান। এবং খুনটা হওয়ার পরই দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করছে ও। কেন? ও কি জড়িত এই খুনের সাথে? যদি হয়, কিভাবে? আমি দেখেছি বন্দুক হাতে অন্য একজনকে দৌড়ে পালাতে। তাহলে কি করে অ্যালান জড়িত হয় এই খুনের সঙ্গে? ওর নির্দেশেই হয়েছে খুনটা? না, কিছু ভাবতে পারছি না আমি। অ্যালান যদি খুনী হয়, নিদেন-পক্ষে খুনীর সহযোগী, আজই শেষ ওর সাথে আমার সম্পর্ক।

'এখনো হাঁপাচ্ছো নাকি তুমি, ডেভিড ?' কোমল গলায় জিজ্ঞেস করলো ও।

'না,' মাথা না তুলে জবাব দিলাম আমি। 'হাঁপাচ্ছি না···এবার আমাকে যেতে হবে, অ্যালান। তোমাকে সত্যিই খুব পছন্দ হয়েছিলো আমার। কিন্তু—কিন্তু···।'

'মানে !? তুমি চলে যাচ্ছো নাকি, ডেভিড ? কোথায় ? কেন ?'

'হ্যাঁ, অ্যালান। তোমার আর আমার পথ এক নয়, ঈশ্বরের-ও নয়। আমাদের এবার আলাদা হতেই হবে।'

'কেন ? তুমি আমাকে ছেড়ে যাচ্ছো এ তো ভাবতেই পারছি না ! কারণটা অন্তত বলো। কেন হঠাৎ করে আমার সঙ্গ অসহ্য হয়ে উঠলো তোমার কাছে ? বলো, ডেভিড।'

'অ্যালান,' বললাম আমি, 'তুমি জানো কলিন ক্যাম্পবেল, তোমার ভাষায় লাল-শেয়াল মরে পড়ে আছে সামনের রাস্তায়, আমাদের ঠিক নিচেই।'

'হ্যাঁ জানি। এবং তোমার ধারণা কীর্তিটা আমার, তাই না মিস্টার ব্যালফোর শ ? তাহলে শোনো, লোকটাকে যদি আমি খুনই করতে চাইতাম তাহলে কখনো নিজের এলাকায় করতাম না। এখানে অমন কিছু করলে আমার নিজের লোকদের ওপরই কেবল বিপদ নেমে আসবে। তাছাড়া—তাছাড়া আমার কাছে কোনো অস্ত্র আছে ? বন্দুক ? তলোয়ার ? দেখতেই পাচ্ছো, মাছ ধরার একটা ছিপ ছাড়া আর কিছু নেই আমার কাছে। তাহলে বলো কি করে আমি খুন করলাম লোকটাকে ?'

'হুঁ। তা বটে।'

কাপড়ের নিচ থেকে লম্বা একটা ছোরা বের করলো অ্যালান। ফলাটা

হাতের মুঠোয় ধরে গাঢ় স্বরে বললো, 'এই আমি পবিত্র ইস্পাত ছুঁয়ে শপথ করছি, ডেভিড, আমি খুন করিনি লাল-শেয়ালকে। কোনো ভাবেই আমি জড়িত নই ব্যাপারটায়। আমার নির্দেশে ঘটেনি এ কাজ, আমার সমর্থন-ও ছিলো না ওতে।'

'ওহ্, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!' হাত বাড়িয়ে দিলাম আমি ওর দিকে। 'আমাকে বাঁচালে তুমি, অ্যালান।'

হাতটা ধরলো না অ্যালান, যেন দেখতেই পায়নি।

'এই হলো ক্যাম্পবেলদের নিয়ে যন্ত্রণা,' বললো ও।

ওর কথায় কান দিলাম না আমি। বললাম, 'জাহাজে যে কথা বলেছিলে তারপর আমাকে দোষ দিতে পারো না, অ্যালান। আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, যা বলেছিলে সেই মতো কাজ করোনি তুমি। উহ! ঠাণ্ডা মাথায় একটা লোকের প্রাণ নিয়ে নেয়া! আমি ভাবতেই পারি না!' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলাম আমি। তারপর আবার বললাম, 'তুমি জানো কে করেছে কাজটা? কালো কোট পরা ঐ লোকটাকে তুমি চেনো?'

'ভালো করে মনে নেই আমার লোকটার চেহারা,' ধূর্ত একটু হেসে বললো অ্যালান। 'পলকের জন্যে মাত্র দেখেছিলাম। আচ্ছা, কোট-টার রঙ তুমি কি বলছো? কালো? আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আমি নীল দেখেছি।

'কালো হোক আর নীল-ই হোক, তুমি চেনো না ওকে?'

'ঠিক বলতে পারছি না। ও যখন আমার পাশ দিয়ে দৌড়ে যায় আমি তখন জুতোর ফিতে বাঁধছিলাম।'

'শপথ করে বলতে পারো, তুমি চেনো না ওকে?'

'না, তা বলতে পারি না। তবে একটা কথা কি জানো, ভুলে যাও-

য়ার ব্যাপারে আমার স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর, বুঝলে ডেভিড ?'

'দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ হঠাৎ সোজা হয়ে পেছন ফিরে তাকাচ্ছিলে কেন? লাল কোর্তারা যেন তোমাকে দেখতে পায়, তাই না ? ওরা তোমার পেছনে ছুটুক এই ফাঁকে পালিয়ে যাক আসল খুনী, এই তো তুমি চেয়েছিলে ঠিক কি না, অ্যালান ?'

'অ্যা, তোমার ধারণা ভুল তা আমি বলবো না, ডেভিড। লোকটা বুঝে হোক, না বুঝে হোক ভয়ানক বিপদে জড়িয়ে গেছে। আমারই গোত্রের মানুষ, এখন ওকে সাহায্য করবো না? এর ভেতর খারাপটা কি দেখছো তুমি ?'

'না, খারাপ কিছু নেই।' আবার আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম ওর দিকে।

দুহাতে ধরলো ও আমার হাতটা। বললো, 'এখনো তুমি কোনো অপরাধ করোনি, ডেভিড। যদি করতে তবু হয়তো তোমাকে ক্ষমা করতাম। সত্যিই বলছি, তোমাকে ভীষণ ভালো লেগেছে আমার।' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল ওর মুখ। 'ডেভিড, এক্ষুণি এখান থেকে ভেগে পড়তে হবে আমাদের। সারা অ্যাপিনে এখন তল্লাশি চালাবে লাল-কোর্তারা। চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ায় যেমন, ঠিক তেমন করে।'

'তাতে আমার ভয়ের কি ?' বললাম আমি। 'আমি কোনো অপরাধ করিনি। আমার দেশের আইন তো অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার জন্যে।'

'যেন এটা তোমার দেশ !'

'নয় তো কি ? এটা স্কটল্যাণ্ড নয় ?'

'স্কটল্যাণ্ড, তবে ইংল্যাণ্ড নয়। শোনো, ডেভিড, তুমি বুঝতে পারছো না একজন ক্যাম্পবেল খুন হয়েছে! খুনী অথবা খুনীর সহযোগী

সন্দেহে তোমাকে নিয়ে যাওয়া হবে একজন বিচারকের সামনে যে একজন ক্যাম্পবেল। বিচার সভায় যারা জুরি থাকবে তারাও ক্যাম্পবেল। এই পরিস্থিতিতে কি বিচার তুমি আশা করো? লাল-শেয়ালের ভাগ্যে যে বিচার জুটেছে তোমার কপালেও তাই জুটবে।'

স্বীকার করছি, অ্যালানের এই ব্যাখ্যা শুনে আমি একটু শঙ্কিত হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় যাবো আমরা, অ্যালান?'

'তুমি কোথায় যাবে সেটা তুমি ঠিক করবে। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাবো দক্ষিণে নিচু এলাকার দিকে।'

দক্ষিণে, নিচু এলাকার দিকে! দক্ষিণের নিচু এলাকায়ই তো আমার বাড়ি। শ বাড়ি, আমার উত্তরাধিকার রয়েছে সেখানে। ফিরে গিয়ে ওসব দাবি করতে হবে আমাকে। পাষণ্ড এবেনের চাচাকেও উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। মুহূর্তে ভাবনাগুলো চক্কোর দিয়ে গেল আমার মাথায়।

'তোমার সঙ্গে যাবো আমি, অ্যালান,' অবশেষে আমি বললাম।

'ভালো করে ভেবে দেখো, ডেভিড। যত সহজ ভাবছো ততো সহজ হবে না ব্যাপারটা। ওরা হন্যে কুকুরের মতো তাড়া করবে আমাদের। প্রচণ্ড কষ্ট করতে হবে। শীত আর ক্ষুধা সহ্য করতে হবে। অনেক রাতে হয়তো ঘাস হবে বিছানা আর আকাশ হবে ছাদ। আমি অভ্যস্ত এ জীবনে, কিন্তু তুমি কি পারবে ওসব সহ্য করতে? অবশ্য এ ছাড়া কোনো পথ-ও দেখছি না সামনে। হয় পালাতে হবে, এবং এমন কষ্ট করেই, নয় তো ফাঁসিতে ঝুলতে হবে।'

'আমি যাচ্ছি, অ্যালান, তোমার সাথে। অবশ্য তুমি যদি না নিতে চাও তাহলে ফাঁসিতে ঝুলবো, আর কি করা যাবে!'

'বেশ বেশ।'

হাত বাড়িয়ে দিলো ও আমার দিকে। দুই ভাইয়ের মতো হাত মেলালাম আমরা।

'লাল-কোর্তারা এখনো আছে না চলে গেছে আগে দেখে আসি চলো,' বললো অ্যালান। তারপর আমার হাত ধরে এগোলো বনের উত্তর-পূর্ব প্রান্তের দিকে।

মোটা একটা গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিলো ও। চুপচাপ কিছু-ক্ষণ দেখার পর ঘুরে তাকালো আমার দিকে।

'এখনো আছে ওরা। হন্যে হয়ে খুঁজছে আমাদের। ভাব ভঙ্গি দেখে মনে হলো, ওরা স্বপ্নেও সন্দেহ করেনি, আমরা এখানে ফিরে এসেছি। যাক, ভালোই হয়েছে, ওরা খুঁজতে থাকুক, এই ফাঁকে এসো কিছু মুখে দিয়ে নি, তারপর আগে যাবো অচার্ন-এ আমার চাচাতো ভাইয়ের বাসায়। ওখান থেকে কাপড় চোপড় পাল্টে রওনা হয়ে যাবো দক্ষিণের পথে।'

আবার বসলাম আমরা। পকেট থেকে খাবার বের করলো অ্যালান, আমার সঙ্গেও কিছু ছিলো। দু'জনেরটাই ভাগাভাগি করে খেলাম দু'জনে।

'আচ্ছা, ডেভিড, তুমি অ্যাপিন-এ পৌঁছুলে কি করে?' খেতে খেতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো অ্যালান।

'সে লম্বা গল্প, পরে এক সময় বলবো। তার চেয়ে তুমি বলো, তোমরা কভেন্যান্ট থেকে তীরে এলে কি করে।'

'সে-ও লম্বা গল্প। আমি আগে জানতে চেয়েছি, সুতরাং তুমি আগে বলবে। তারপর আমি শোনাবো আমার কাহিনী।'

অগত্যা বলতে হলো অ্যালানকে। সাগরে পড়ে যাওয়ার পর থেকে

এখানে ওর সাথে দেখা হওয়ার আগ পর্যন্ত কি কি ঘটেছে আমার জীবনে সব খুলে বললাম।

ইতিমধ্যে খাওয়া শেষ আমাদের। অ্যালান উঠে উঁকি দিলো আবার। নেই লাল কোর্তারা। অচার্ন-এর পথে রওনা হলাম দু'জন পাহাড় আর বনের ভেতর দিয়ে।

'এবার তোমার কাহিনী, অ্যালান,' কিছু দূর হাঁটার পর বললাম আমি।

শুরু করলো অ্যালান।

'বিশাল ঢেউটাকে আসতে দেখে আঁতকে উঠলাম আমি। চিৎকার করে তোমাকে সাবধান করতে যাবো, তার আগেই দেখি ভেসে গেছো তুমি। মুহূর্তের জন্যে একবার দেখলাম তোমাকে ঢেউটার মাথায় তারপর হাজার খুঁজেও আর তোমার পাত্তা পেলাম না। এর ভেতরে আগেরটার চেয়ে বড় আরেকটা ঢেউ এসে পড়েছে। নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম আমি, অন্যরাও। ঝটপট নৌকায় উঠে পড়লাম সবাই। প্রথম ঢেউয়ের ধাক্কায় জাহাজের সামনেটা উঠে গিয়েছিলো, পেছনটা চলে গিয়েছিলো পানির নিচে; এবারের ঢেউ ডুবিয়ে দিলো সামনেটা, পেছনটা রইলো উপরেই। ওহ, ফোরকাস্‌লের ভেতর কিভাবে বন্যার তোড়ের মতো পানি ঢুকছিলো তা যদি দেখতে!' সেই দৃশ্য স্মরণ করে এখনও একবার শিউরে উঠলো অ্যালান। 'আহত নাবিক যারা ভেতরে ছিলো তাদের মরণ আর্তনাদ মুহূর্তের জন্যে শুনতে পেয়েছিলাম আমরা। তারপরই খেয়াল করলাম ঢেউয়ের মাথায় নাচছে আমাদের নৌকা। নাবিকদের চিৎকার আর শুনতে পাইনি। বেচারাদের জন্যে দুঃখিত হওয়া ছাড়া আর কিছু করার ছিলো না আমাদের।

দ্বিতীয় ঢেউয়ের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই এসে গেল আরেকটা ঢেউ। পুরো জাহাজটাই এবার আছড়ে পড়লো ডুবো পাহাড়ের ওপর। সামান্য সময়ের জন্যে বাতাস লেগে ফুলে উঠলো পালগুলো। সাঁ করে কাত হয়ে গেল কভেন্যান্ট। তারপরই মনে হলো অদৃশ্য কোনো হাত যেন পাতালের দিকে টানছে জাহাজটাকে। একটু পরে হারিয়ে গেল সেটা সাগরের তলে।

'প্রাণপণে দাঁড় টানছে নাবিকরা। ঢেউয়ের ধাক্কায় অনেক সহজ হয়ে গেল ওদের কাজ। কিছুক্ষণের ভেতর তীরে পৌঁছে গেলাম আমরা। ক্যাপ্টেন হোসিসন তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো এবার। ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে তার মুখের চেহারা। কোনো রকমে নেমে দাঁড়ালো সৈকতের ওপর। পরক্ষণে এক লাফে এসে দাঁড়ালো আমার সামনে। চিৎকার করে তার নাবিকদের উদ্দেশ্যে বললো, তাদের যত দুর্গতি সবকিছুর মূলে নাকি আমি। আমাকে এবার একা পাওয়া গেছে। ওরা লাঠি সোটা নিয়ে আসুক, পিটিয়ে লাশ বানাবে আমাকে।

'কিন্তু কোনো খালাসী এগোনোর আগেই সেই ছোট-খাটো মানুষটা···কি যেন নাম? ঐ যে, লাল চুলওয়ালা ···?'

'রিয়াক,' বললাম আমি।

'হ্যাঁ, রিয়াক, ও ছুটে গিয়ে একটা দাঁড় তুলে নিলো। নাবিকদের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো: "খবরদার এর গায়ে কেউ হাত দিয়েছো কি মরেছো!" আমার ধারণা লোকটা আসলে তত খারাপ নয়। ঐ হোসিসনের কুবুদ্ধিতেই বোধহয় হামলা চালিয়েছিলো আমাদের ওপর।'

'আমারও তাই ধারণা,' বললাম আমি। 'আমার সঙ্গেও প্রথম দিকে খুব ভালো ব্যবহার করেছিলো লোকটা।'

'নাবিকরা একবার রিয়াকের দিকে একবার হোসিসনের দিকে তাকাতে লাগলো,' বলে চললো অ্যালান। 'কয়েক সেকেণ্ড পরেই একজন একজন করে এসে দাঁড়াতে লাগলো রিয়াকের পেছনে। একজন তো হোসিসনকে বলেই বসলো, "তুমিই যত নষ্টের গোড়া, বদমাশ কোথাকার। কি দরকার ছিলো লোকটার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকানোর?"

"'তোমার পথে তুমি যাও, ভাই। আমরাও চলে যাচ্ছি। ক্যাপ্টেন থাক এখানে," আমার দিকে তাকিয়ে রিয়াক বললো। তারপর সত্যিই খালাসীদের সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলো সে সৈকতের ওপর দিয়ে। অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো হোসিসন। ওরা চলে যাওয়ার পর আমার দিকে ফিরলো। ওর চোখে তখনো সেই অসহায় দৃষ্টি। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলাম, তারপর হাঁটতে শুরু করলাম আমিও।'

কুড়ি

সন্ধ্যা ঘুরে গেছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। বন বাদাড় ডিঙিয়ে পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে চলেছি আমরা। অন্ধকারে চলতে খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না অ্যালানের। এ অঞ্চলের পথ ঘাট সব ভালো করে চেনা ওর। আমি কেবল অন্ধের মতো ওকে অনুসরণ করে চলেছি।

অবশেষে রাত প্রায় সাড়ে দশটার সময় একটা পাহাড়ের মাথায় পৌঁছুলাম আমরা। বিরাট একটা বাড়ি দেখতে পাচ্ছি নিচে। জানালাগুলো আলোকিত। উঠানে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে কয়েকটা আলো। সম্ভবত বাতি হাতে আসা যাওয়া করছে মানুষ জন।

'ঐ যে, জেমস স্টুয়ার্টের বাড়ি,' বললো অ্যালান। তারপর হঠাৎই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো ওর কণ্ঠস্বর। 'কিন্তু, হচ্ছে কি ওখানে? এত মানুষ আসা যাওয়া করছে। সৈন্যরা কি আগেই পৌঁছে গেছে আমরা আসতে পারি সন্দেহ করে? মনে হয় না,' শেষের কথাটা বিড় বিড় করে, যেন নিজেকে শোনানোর জন্যেই বললো ও।

এক মুহূর্ত বিরতি নিলো অ্যালান। তারপর উঁচুগ্রামে তীক্ষ্ণ স্বরে শিস বাজালো তিনবার।

প্রথম শিস বাজার সাথে সাথে স্থির হয়ে গেল চলমান আলো-গুলো। দ্বিতীয়টার সময়ও স্থির রইলো। তৃতীয় শিসটা যখন বাজালো অ্যালান তখন আবার নড়াচড়া শুরু হলো। যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো আলোর মালিকরা। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম শিসের মাহাত্ম্য। সংকেত দিলো অ্যালান, ও এসেছে।

নেমে গেলাম আমরা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। বাড়িটার চারপাশে কাঠের বেড়া। উঠানের সামনাসামনি একটা ফটক। ফটকের সামনে পৌঁছে দেখলাম দীর্ঘদেহী পৌরুষদীপ্ত চেহারার একলোক দাঁড়িয়ে। অ্যালানকে দেখেই গেলিক ভাষায় কথা বলে উঠলো সে।

বাধা দিয়ে অ্যালান বললো, 'স্কচ ভাষায় বলো, জেমস। আমার সাথে এক তরুণ ভদ্রলোক আছে বাড়ি দক্ষিণে। আমাদের ভাষা বুঝবে না ও।' আমার দিকে একবার তাকিয়ে আবার জেমস স্টুয়ার্টের দিকে ফিরলো অ্যালান। 'দারুণ ছেলে। ওর নিরাপত্তার খাতিরে আপাতত নামটা প্রকাশ করছি না।'

সহৃদয় ভঙ্গিতে আমাকে সম্ভাষণ জানালো জেমস স্টুয়ার্ট। তার-পর আবার তাকালো অ্যালানের দিকে।

'ভয়ানক ঘটনাটা ঘটলো শেষ পর্যন্ত!' বললো সে। 'এবার কি বিপদ যে আসবে দেশের ওপর জানি না।'

'বিপদ আসুক আর যা-ই আসুক, লোকটার মৃত্যু চাইতাম আমরা এতে তো কোনো সন্দেহ নেই?'

'তা চাইতাম। কিন্তু এখানে, আমাদের এই অ্যাপিনে এমন কিছু ঘটুক কক্ষণো চাইনি। এর দায় কে ঘাড়ে নেবে, অ্যালান? অ্যাপিনে ঘটেছে ঘটনা, অ্যাপিন-এর মানুষকেই মূল্য দিতে হবে এর জন্যে। আমার কথাটা একবার ভাবো। আমার স্ত্রী আছে, ছেলে মেয়ে

আছে। ওরা নির্দোষ। তাই বলে কি ওরা মাফ পাবে লাল কোর্তা-দের কাছে?'

জেমস স্টুয়ার্ট আর অ্যালান যখন এসব আলাপ করছে তখন আমি মুখ ঘুরিয়ে ভালো করে দেখছি বাড়িটা। সব জায়গায় মানুষ। যাচ্ছে, আসছে। মই বেয়ে চালের ওপর উঠছে কেউ কেউ। বেশির ভাগ লোকেরই হাতে বন্দুক, পিস্তল, তলোয়ার এবং আরো নানা ধরনের অস্ত্র। বাড়ির ভেতর থেকে, চাল থেকে, গোলাঘর থেকে বের করে লুকিয়ে রাখার জন্যে নিয়ে যাচ্ছে মাঠে, পাহাড়ে বা বনে। লাল-কোর্তারা এসে যেন কোনো অস্ত্র না পায় বাড়িতে তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এ সময় অল্পবয়েসী এক কাজের মেয়ে কাঁধে একটা বোঝা নিয়ে বেরিয়ে এলো বাড়ি থেকে।

'কি নিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা?' জিজ্ঞেস করলো অ্যালান।

'বাড়ির সবকিছু ঠিকঠাক মতো গুছিয়ে রাখছি আমরা,' জবাব দিলো জেমস স্টুয়ার্ট। 'লাল-কোর্তারা এলে সন্দেহ করার মতো কিছু যেন না পায়। অস্ত্রশস্ত্র সব সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। মেয়েটা বোধ-হয় তোমার ফরাশি পোশাকগুলো নিয়ে যাচ্ছে। অস্ত্রের সঙ্গে ওগুলোও মাটিতে পুঁতে রেখে আসবে।'

'আমার ফরাশি পোশাক মাটিতে পুঁতে রেখে আসবে!' চেঁচিয়ে উঠলো অ্যালান। 'মাথা খারাপ নাকি? ওগুলো পরার জন্যেই তো এলাম এতদূর!' বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে মেয়েটার কাছ থেকে বোঁচকাটা নিয়ে নিলো ও। তারপর ঢুকলো বাড়ির ভেতর।

আমি আর জেমস স্টুয়ার্ট অনুসরণ করলাম ওকে। পোশাক বদলা-নোর জন্যে অন্দর মহলের দিকে চলে গেল অ্যালান। জেমস স্টুয়ার্ট

রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো আমাকে। নিজেও বসলো একটা চেয়ারে। দুশ্চিন্তার রেখা তার কপালে। বাড়ির সবাই যেন তটস্থ হয়ে আছে। জেমস-এর স্ত্রীকে দেখলাম আগুনের সামনে বসে কাঁদছে অসহায়ভাবে। তার বড় ছেলে মাটিতে বসে এক বোঝা কাগজপত্র পরীক্ষা করছে। একটা বা দুটো কাগজ আগুনে ফেলে দিচ্ছে সে। অন্যগুলো গুছিয়ে রাখছে যত্নের সাথে। চাকর-বাকরেরা ছোটাছুটি করছে; একবার বাইরে যাচ্ছে আবার ভেতরে আসছে। একটু পর-পরই অধীনস্থ কোনো কৃষক আসছে। কিছু জিজ্ঞাসা করছে। জবাব পেয়ে চলে যাচ্ছে আবার ত্রস্ত পায়ে।

বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারলো না জেমস। উঠে পায়চারি শুরু করলো। ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে একবার তাকালো আমার দিকে।

'ভীষণ অস্থির হয়ে আছে মনটা,' বললো সে। 'তোমার সঙ্গে যে একটু স্বস্তিতে কথা বলবো তা-ও পারছি না। কিছু মনে করছো না তো তুমি? আসলে ভয়ানক বিপদ আমাদের সামনে। যে কোনো মুহূর্তে এসে পড়তে পারে লাল-কোর্তারা। আর ওরা যদি আসে স্রেফ বাঁদর নাচ নাচিয়ে ছাড়বে।'

একটু পরেই বুঝলাম সত্যি কেমন অস্থির হয়ে আছে সে। বেখেয়ালে একটা দরকারী কাগজ আগুনে ফেলে দিলো ছেলেটা, হঠাৎ করেই নজরে এলো জেমস-এর। এক লাফে ছেলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো সে। তারপর অকথ্য ভাষায় গালাগালি করতে করতে সমানে থাপ্পড় মেরে চললো। আমি, একজন বাইরের মানুষ যে সেখানে রয়েছি তাতে কোনো বিকারই হলো না তার।

একটু পরে যখন অ্যালান ফিরলো, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম আমি। ফরাশি পোশাক পরে এসেছে ও। চমৎকার দেখাচ্ছে। আসলে

যে কোনো পোশাকেই দারুণ লাগে ওকে।

এরপর পোশাক বদলানোর পালা আমার। জেমস-এর এক ছেলে আমাকে নিয়ে গেল বাড়ির ভেতর। নতুন এক প্রস্থ পোশাক দিলো। আমারগুলো খুলে ঝটপট পরে নিলাম সেগুলো। তারপর ফিরে এলাম রান্না ঘরে। রওনা হওয়ার জন্য তৈরি আমরা এখন। কিন্তু সমস্যা হলো টাকা পয়সা নিয়ে। আমার কাছে আছে দুটো গিনি। আর অ্যালানের কাছে মাত্র সতেরো পেন্স। জাহাজে থাকতে ওর কাছে যে গিনিগুলো দেখেছিলাম সেগুলো আর্ডশিয়েলকে পৌঁছে দেয়ার জন্যে ফ্রান্সে যাচ্ছে এমন এক বিশ্বস্ত জ্যাকবাইট-এর হাতে দিয়ে দিয়েছে ও। এখন ওর পকেটে আছে ঐ সতর পেন্সই। জেমস স্টুয়ার্ট-ও বিশেষ কিছু দিতে পারলো না।

'মাত্র এই ক'টাকা নিয়ে এত দূরের পথ যাবো কি করে?' বললো অ্যালান।

'অ্যালান,' বললো জেমস, 'এক্ষুণি রওনা হতে হবে তোমাকে। আপাতত কাছাকাছি কোথাও গিয়ে থাকো। পরে আমাকে জানিও কোথায় আছো, আমি টাকা পাঠিয়ে দেবো। এখন টাকার জন্য দেরি করলে তুমিও মরবে আমিও মরবো। ওরা খুঁজছে তোমাকে। আমার বাড়িতে যদি পায় তাহলে কি হবে বুঝতে পারছো?'

'হ্যাঁ পারছি। ঠিক আছে আমরা তাহলে যাই। দরকার পড়লে টাকার জন্যে লোক পাঠাবো, নয়তো আমি নিজেই আসবো। তুমি ভেবো না।' আমার দিকে ফিরলো অ্যালান। 'চলো ডেভিড, আমরা রওনা হই। দুই গিনি সতেরো পেন্সই ভরসা।'

বেরিয়ে এলাম আমরা জেমস স্টুয়ার্টের বাড়ি থেকে। রাতের আঁধারের সাথে মিশে এগিয়ে চললাম পুব দিকে।

একুশ

রাতের আঁধারের সাথে মিশে এগিয়ে চলেছি আমরা। কখনো হাঁটছি, কখনো দৌড়াচ্ছি। ভোর যত কাছিয়ে আসছে হাঁটার চেয়ে দৌড়ানোর পরিমাণ তত বাড়ছে। উপরে উপরে দেশটাকে জনশূন্য মনে হলেও ঘর বাড়ি আছে এখানে—যদিও অনেক ফাঁকে ফাঁকে, পাহাড়ের খাঁজে নির্জন জায়গায়। সে সব বাড়িতে আছে মানুষজন। ইতিমধ্যে অমন গোটা বিশেক বাড়ি পেরিয়ে এসেছি আমরা। প্রতিটার সামনে থেমেছে অ্যালান। দরজা ধাক্কিয়ে ধাক্কিয়ে গৃহস্বামীকে জাগিয়েছে। তারপর জানিয়েছে কলিন রয় ক্যাম্পবেলের মৃত্যু সংবাদ।

বার বার থেমে এমন সময় নষ্ট করছে কেন জিজ্ঞেস করলাম অ্যালানকে। জবাবে ও বললো, এদেশের রীতিই নাকি ও রকম। কারো বাড়ির কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় গুরুত্বপূর্ণ কোনো খবর থাকলে গৃহস্বামীকে তা জানিয়ে যাওয়া কর্তব্য। নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য পালনের ফল হলো ভোর হয়ে যাওয়ার পরও নিরাপদ কোনো আশ্রয়ে পৌঁছুতে পারলাম না আমরা।

ফাঁকা একটা উপত্যকায় এসে পড়েছি। চারদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ছোট ছোট পাহাড়। মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সরু একটা

খরস্রোতা নদী। আশেপাশে বাড়িঘর তো দূরের কথা লুকানোর মতো গাছপালাও নেই। কেবল পাহাড় আর পাথর।

চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে অ্যালানের মুখের চেহারা যা হলো সে দেখবার মতো। জোর করে কেউ যেন নিম পাতার শরবত গিলিয়ে দিয়েছে।

'এ জায়গার ওপর নজর রাখতে বাধ্য ওরা,' সন্ত্রস্ত গলায় বললো ও।

তারপর আর কিছু না বলে প্রাণপণে ছুটলো নদীর দিকে। তিন পাথরের মাঝে যেখানে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে নদীর ধারা সেখানে পৌঁছে ডানে বাঁয়ে না তাকিয়ে সোজা দীর্ঘ এক লাফ দিয়ে নদী পেরিয়ে উঠে পড়লো মাঝখানের পথটার ওপর। হাত আর হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে পড়লো তাল সামলানোর জন্যে। অ্যালানের এই আচরণ দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম আমি। এক সেকেণ্ড পরে আমিও ছুটলাম নদীর দিকে। অ্যালানের ভঙ্গি অনুকরণ করে লাফিয়ে নদী পেরিয়ে উঠে পড়লাম পাথরটার ওপর।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি আমরা ছোট্ট পাহাড়ের মতো পাথরটার ওপর। খরস্রোতা নদীর জল পাথরে বাধা পেয়ে ছিটকে উঠছে। আমাদের চোখ মুখে এসে লাগছে পানি।

শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসতেই পকেট থেকে একটা ব্র্যাণ্ডির বোতল বের করে আমার মুখের সামনে ধরলো অ্যালান। প্রায় জোর করে বেশ খানিকটা ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় রক্ত উঠে আসতে চাইলো আমার। এক সেকেণ্ড পর অ্যালান তার মুখটা আমার কানের কাছে এনে তীব্র স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো: 'লাফ দাও নয়তো মরো!' এবং তক্ষুণি আমার দিকে পেছন ফিরে আগের মতো

দীর্ঘ এক লাফে ও চলে গেল নদীর ওপারে।

পাথরটার ওপর একা আমি এখন। অ্যালানের দিকে তাকালাম। হাসি হাসি মুখ ওর। ইশারায় লাফিয়ে চলে যেতে বলছে ওপারে। পাথর থেকে নদীর ওপারের দূরত্ব বেশ খানিকটা। অন্য সময় হলে সাহসই পেতাম না লাফ দেয়ার। কিন্তু এখন, প্রাণের ভয়ে না ব্র্যাণ্ডির প্রভাবে জানি না, নির্ভয়ে লাফ দিলাম। ওপরে পৌঁছুলামও। কিন্তু কপাল খারাপ আমার, পা হড়কে গেল। হাত দুটো দিয়ে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করলাম পাথরের পাড়। হাত-ও পিছলে গেল। সময় মতো অ্যালান এসে ধরায় বেঁচে গেলাম এ যাত্রা। নয়তো পাহাড়ী নদীর তীব্র স্রোতের মুখে ভেসে যেতাম নির্ঘাৎ।

টেনে হেঁচড়ে পাড়ের ওপর ওঠালো আমাকে অ্যালান। দম নেয়ার জন্যে সময় দিলো মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। তারপর, 'এসো!' বলেই ছুটলো আবার, প্রাণ ভয়ে ভীত খরগোশের মতো। অগত্যা আমিও ছুটলাম ওর পেছন পেছন। বেশ দূরে বিরাট একটা পাথরের চাঁইয়ের কাছে পৌঁছে থামলো ও।

বলেছি বিরাট একটা পাথর, আসলে দুটো পাথর। মাথার দিকে হেলান দিয়ে আছে একটার সাথে অন্যটা। উচ্চতা আনুমানিক বিশ ফুট। প্রায় খাড়া উঠে গেছে। প্রথম দর্শনে মনে হয়, কিছুতেই ওঠা যাবে না ওপরে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলাম ওটার ওপরেই ওঠার চেষ্টা করছে অ্যালান। প্রথম দু'বার ব্যর্থ হলো। তৃতীয় বারের বার উঠে পড়তে পারলো ওপরে।

উঠেই কোমর থেকে লম্বা চামড়ার বেল্টটা খুলে ঝুলিয়ে দিলো অ্যালান। বললো, 'শক্ত করে ধরো! আমি টেনে তুলছি তোমাকে!'

স্বয়ংক্রিয়ের মতো হাত দুটো উঠে গেল আমার। বেল্টটা ধরলাম।

টানতে লাগলো অ্যালান। আমিও পাহাড়ে পা বাধিয়ে চেষ্টা করলাম ওঠার। একটু পরে পৌঁছে গেলাম উপরে।

পাথর দুটোর চূড়া এক জায়গায় মিলে একটা গর্ত মতো তৈরি করেছে। তস্তরী বা থালা যেমন হয় অনেকটা তেমন। অনায়াসে তিন চারজন মানুষ শুয়ে থাকতে পারবে সেখানে, বাইরে থেকে দেখা যাবে না। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম কেন এখানে এসেছি আমরা। স্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছে অ্যালানের চোখে মুখে।

'যাক, বাবা,' বললো ও, 'অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে নিশ্চিন্ত।' একটু চুপ করে থেকে আবার বললো, 'উহু, কি মারাত্মক ভুলটাই না করেছি! না না, তোমার দোষ নেই, আমিই দায়ী।'

'মানে! কি ভুল আবার করলে তুমি?'

'কি ভুল শুনবে? আমি অ্যালান ব্রেক স্টুয়ার্ট পথ ভুল করেছি, তাও আবার আমার নিজের দেশ অ্যাপিন-এ। যাগোক, আগামীতে আর এমন ভুল হবে না আশা করি। এবার তুমি শুয়ে পড়ো। একটু ঘুমিয়ে নাও। আমি পাহারায় থাকছি।'

বিনাবাক্যব্যয়ে শুয়ে পড়লাম আমি দুই পাথরের চূড়ার মাঝখানে। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি বলতে পারবো না, হঠাৎ শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার মতো একটা অনুভূতি হওয়ায় জেগে গেলাম। দেখলাম, আমার মুখের ওপর হাত চাপা দিয়ে রেখেছে অ্যালান।

'শ্‌ শ্‌ শ্‌,' ফিসফিস করে বললো ও, 'তুমি দেখি নাক ডাকছো!'

'তাই নাকি? যা ক্লান্ত হয়েছি ডাকবে না-ই বা কেন?'

পাথরের কিনার থেকে সামান্য মাথা উঁচিয়ে উঁকি দিলো অ্যালান। একটু পরে আমাকেও ডাকলো দেখার জন্যে।

সূর্য বেশ উপরে উঠে এসেছে। আকাশ মেঘশূন্য পরিষ্কার। পাথ-

রের চূড়া থেকে বহুদূর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। প্রায় আধমাইল মতো দূরে নদীর তীরে একটা শিবির, লাল কোর্তাদের। বিরাট একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে তার মাঝখানে। সৈনিকদের কয়েকজন রান্না করছে। বাকিরা হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে বা বসে রয়েছে। কাছেই উঁচু একটা পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একজন প্রহরী। তার চকচকে শিরোস্ত্রাণ আর অস্ত্রগুলো রোদ পড়ে ঝিকিয়ে উঠছে। নদীর তীরেও বেশ কয়েকজন প্রহরী, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নজর রাখছে চারপাশে। কিছু ঘোড়সওয়ার সৈনিককেও দেখলাম। টহল দেয়ার ভঙ্গিতে একবার চলে যাচ্ছে দূরে আবার ফিরে আসছে।

একপলক তাকিয়েই দেখে নিলাম এতগুলো জিনিস। আবার ফিরে এলাম আগের জায়গায়। শুয়ে পড়লাম।

'দেখেছো, ডেভি,' বললো অ্যালান, 'যা ভয় পাচ্ছিলাম ঠিক তাই। বড় বাঁচা বেঁচে গেছি আজ। আর একটু দেরি হলেই ওদের চোখ এড়াতে পারতাম না। এখনও যে আমরা খুব একটা নিরাপদ তা নয়, ঐ উঁচু পাহাড়গুলোয় উঠে দূরবীন চোখে তাকালেই দেখে ফেলবে আমাদের। সান্ত্বনা একটাই, আপাতত ওরা কেউ পাহাড়ের দিকে এগোচ্ছে না! দিনটা কোনো রকমে কেটে গেলে হয়। রাতে হয়তো পালানোর সুযোগ পাওয়া যাবে।'

'রাতের তো বহু দেরি। ততক্ষণ কি করবে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'শুয়ে থাকবো এখানে।'

সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমাকাশে। এখনো আমরা শুয়ে আছি সেই পাথরের ওপর। কিছুক্ষণ পরপরই অ্যালান কিনারে গিয়ে উঁকি

দিচ্ছে। ফিরে এসে জানাচ্ছে, লাল-কোর্তাদের বর্তমান অবস্থা। টহল দিতে দিতে এদিকে চলে এসেছে ওরা। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে আঁতিপাঁতি করে কিছু একটা খুঁজছে উপত্যকায়। আমাদেরকেই যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অবশেষে আরো নেমে গেল সূর্য। পাহাড় আর পাথরের দীর্ঘ ছায়া পড়লো উপত্যকার পুব দিকে। সৈন্যরাও এসে পড়েছে আমাদের পশ্চিম পাশে।

'এসো!' ফিসফিস করে বললো অ্যালান। তারপর নিঃশব্দে গড়িয়ে নেমে গেল যেদিকে ছায়া পড়েছে সেদিকে।

ঢিপ ঢিপ করছে বুকের ভেতর। সৈন্যরা এত কাছে এসে গেছে তবু অ্যালান নেমে পড়লো কেন বুঝতে পারছি না। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে আমিও নামলাম। দেখলাম, পাথরের ছায়ায় শুয়ে পড়েছে অ্যালান। আমাকেও ইশারায় শুয়ে পড়তে বললো।

এক ঘণ্টারও বেশি সেখানে শুয়ে রইলাম আমরা। প্রতি মুহূর্তেই ভয়, এই বুঝি পাথরের এপাশে এসে পড়লো লাল-কোর্তারা। ওদের হৈ-চৈ, চিৎকার শুনতে পাচ্ছি। ঘোড়ার খুরের শব্দও। শ্বাস বন্ধ করে পড়ে আছি আমি। ঈশ্বরের নাম জপছি। এবার আর রক্ষা নেই। পাথরটার এপাশে না আসার কোনো কারণ নেই লাল-কোর্তাদের।

কিন্তু ভাগ্য ভালো আমাদের, এলো না ওরা। পাথরটার পশ্চিম পাশ দিয়ে চলে গেল বীর বিক্রমে। ঘোড়ার শব্দ, হৈ-চৈ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল দূরে।

'এই সুযোগ!' বললো অ্যালান। চলো তো দেখি, ছায়ায় ছায়ায় কিছুদূর এগিয়ে যেতে পারি কিনা!'

ছুটলো অ্যালান। পেছন পেছন আমি। এক পাথর থেকে অন্য পাথরের আড়ালে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়াচ্ছি। অ্যালান উঁকি দিয়ে দেখছে সৈনিকদের অবস্থা। তারপর দিক ঠিক করে মাথা নুইয়ে আবার ছুটছি অন্য একটা পাথরের দিকে।

সন্ধ্যা নাগাদ বেশ কিছুদূর এগিয়ে যেতে পারলাম আমরা। পাথরের আড়ালে আড়ালে থামতে হচ্ছে বার বার, ফলে খুব দ্রুত ছুটতে পারছি না। তবু যেটুকু এগোলাম, আমার ধারণা, কম নয়। এখন আর তত ভয় লাগছে না। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে মানুষ যেমন মরীয়া হয়ে ওঠে আমাদের এখন সে অবস্থা।

অবশেষে এমন একটা জায়গায় এলাম, ভয়, শঙ্কা, মরিয়া ভাব সব লুপ্ত হয়ে গেল। সামনে চমৎকার ছোট্ট একটা ঝরনা। টলটলে ঠাণ্ডা পানি বয়ে যাচ্ছে কুল কুল করে। সব ভুলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমরা। উপুড় হয়ে মুখ ডুবিয়ে দিলাম পানিতে। সারাদিনের ক্লান্তি শেষে ঠাণ্ডা পানির এই পরশটুকু যে কি ভালো লাগলো তা যদি ভাষায় প্রকাশ করতে পারতাম! বুভুক্ষের মতো চোঁ চোঁ করে খেয়ে নিলাম পানি। আহ! কি স্বাদ সে পানির!

আমরা শুয়ে রইলাম সেখানে। ঝরনার উঁচু পাড় সৈনিকদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করছে আমাদের। সুতরাং চিন্তা নেই। একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার পানি খেলাম। একটু পরে আবার। গায়ের কাপড় খুলে ফেলে সারা শরীর ধুয়ে নিলাম। যতক্ষণ না শীত লাগতে শুরু করলো ততক্ষণ এমন চালিয়ে গেলাম।

গা, হাত, পা মুছে কাপড় চোপড় পরলাম অবশেষে। খাবারের পুটুলি থেকে লোহার একটা পাত্র আর খানিকটা যবের ছাতু বের করলো অ্যালান। ছাতুটুকু পাত্রে নিয়ে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে মাখলো।

সারা দিনের অনাহারের পর যথেষ্ট ভালো লাগলো এ সামান্য খাবার। ইতিমধ্যে পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। আবার রওনা হলাম আমরা।

বাইশ

ভোর হওয়ার আগেই গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম। জায়গাটা বিশাল এক পাহাড়শ্রেণীর মাথায় একটা চূড়া। নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা নদী। চূড়ার এক পাশে নিচু একটা পাথুরে গুহা। বার্চ গাছের সারি মাথা তুলেছে পাহাড়ের ঢালে। কিছু দূরে অন্য এক পাহাড়ের ঢালে পাইনের বন। দূরে তাকালে দেখা যায় সাগরের সরু একটা বাহু অ্যাপিন থেকে আলাদা করে রেখেছে দেশটাকে।

চূড়ার নাম হিউগ অফ করিনাকিয়েগ। সাগরের খুব কাছে হলেও উচ্চতার কারণে প্রায়ই মেঘে ঢেকে থাকে ওটা। সে সময় গুহার বাইরে এলে ভিজে যেতে হয়। তা সত্ত্বেও পাঁচটা দিন খুব আনন্দের সাথেই কাটিয়ে দিলাম এই চূড়ায়।

গুহায় ঘুমালাম। পাহাড়ের ঢাল থেকে কেটে আনা ঘাস দিয়ে বিছানা করলাম। শীত নিবারণ করলাম অ্যালানের বিরাট ঝুল কোট দিয়ে। দিন কাটলো নদী থেকে মাছ ধরে আর অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে। মাঝে মাঝে আমাকে তলোয়ার চালানোর নানা কৌশল শেখালো অ্যালান।

'আমরা যে করিনাকিয়েগ-এর চূড়ায় আশ্রয় নিতে পারি তা

ওদের মাথায় আসতেই অনেক দিন লাগবে,' প্রথম দিন ভোরে বললো অ্যালান। 'এবার আমরা জেমস-এর কাছে খবর পাঠাতে পারি।'

'খবর পাঠাবে! কি করে?' প্রশ্ন করলাম আমি। 'আশেপাশে মানুষজন আছে বলে তো মনে হয় না।'

'দেখই না, কি করে পাঠাই।'

খোঁজাখুঁজি করে একটা জায়গা বের করলো ও যেখানে কখনো কেউ আগুন জ্বেলেছিলো। কাঠ কয়লা পাওয়া গেল সেখানে। এক টুকরো কাঠ যোগাড় করে সেটাকে ছুরি দিয়ে কেটে ক্রসের চেহারা দিলো। তারপর কয়লা ঘষে কালো করে ফেললো ক্রসের চার প্রান্ত।

'আমার বোতামটা দিতে পারবে?' সংকুচিত ভাবে বললো সে, ভাবখানা উপহার দেয়া জিনিস ফেরত চাইতে লজ্জা লাগছে।

দিলাম আমি। ঝুল কোটের কোনা থেকে সরু এক চিলতে কাপড় কেটে নিয়ে তা দিয়ে ক্রসের সাথে বোতামটা বেঁধে দিলো অ্যালান। তারপর সেটার সাথে বাঁধলো সরু একটা বার্চের ডালের টুকরো আর একটা পাইন-এর টুকরো। সন্তুষ্ট ভঙ্গি ফুটে উঠলো ওর চেহারায়।

'হ্যাঁ, হয়েছে,' বললো অ্যালান। 'এটা বানালাম কেন জানো?'

'কেন?'

'কাছেই একটা গ্রাম আছে। খুব ছোট যদিও, তবু গ্রাম। ওখানকার অনেকেই আমার বন্ধু—খুবই বিশ্বস্ত বন্ধু। কিন্তু কিছু লোক আছে যাদের সম্পর্কে আমি ঠিক নিশ্চিত নই। বন্ধু হতেও পারে না-ও হতে পারে। এর ভেতর নিঃসন্দেহে ক্যাম্পবেলরা ঘোষণা করে

দিয়েছে, আমাদের ধরিয়ে দিতে পারলে মোটা অঙ্কের পুরস্কার দেয়া হবে। সুতরাং বুঝতেই পারছো ঐ মুহূর্তে এ গ্রামে যাওয়া পুরোপুরি নিরাপদ নয় আমার জন্যে। আবার ওখানে না যেতে পারলে জেম-সের কাছে খবর পাঠানোও সম্ভব নয়।' একটু থামলো অ্যালান। তারপর আবার বলতে লাগলো, 'তাই ভেবে চিন্তে এই বুদ্ধিটা বের করেছি। গভীর রাতে গ্রামের সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকবে জন ব্রেক ম্যাককল নামের এক বন্ধুর বাড়ির জানালায় এটা রেখে আসবো।'

'তাতে কি লাভ হবে? গ্রাম পর্যন্ত যখন যাবেই তাকে জাগিয়েই তো খবরটা দিয়ে আসতে পারো?'

'তা পারি, কিন্তু দেবো না। ওকে জাগাতে গেলে ওর বউ ছেলে মেয়ে ও জেগে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ওরা সবাই জেনে যাবে, গভীর রাতে অ্যালান ব্রেক এসেছিলো বাড়িতে। তারপর যদি মুখ ফস্কেও ওরা শত্রুভাবাপন্ন কারো কাছে প্রকাশ করে দেয় কথাটা তখন অবস্থা কি হবে কল্পনা করতে পারো?'

'হুঁ, পারছি,' বললাম আমি। 'কিন্তু তোমার এই বিদঘুটে জিনিস রেখে আসলে কি লাভ হবে?'

'হবে হবে। শোনো বলছি: এই ক্রসটা দেখেছো তো, অনেকটা আগুনে ক্রস-এর (fiery cross) মতো করে তৈরি করেছি?'

'হ্যাঁ।'

'আমাদের গোত্রের একটা সাংকেত হলো আগুনে ক্রস। এর অর্থ, সমবেত হও তবে এক্ষুণি কিছু ঘটিয়ে বোসো না। লোকটা যখন সকালে উঠে দেখবে জানালায় একটা আগুনে ক্রস রেখে গেছে কে যেন, অথচ কিছু লেখা নেই তাতে, তখন তার মাথায় যে কথাটা আসবে তা হলো: ব্যাপার কি, পুরো গোত্রকে সমবেত হওয়ার নির্দেশ

দিচ্ছে কে ? তাও আবার গোপনে ! এরপর আমার বোতামটা চোখে পড়বে তার—আসলে ওটার মালিক ডানকান স্টুয়ার্ট। তখন সে মনে মনে বলবে : ডানকানের ছেলে, নিশ্চয়ই আমার সাহায্য চায়। তার মানে কাছাকাছি কোথাও আছে সে।'

'বেশ,' বললাম আমি, 'ও বুঝলো কাছাকাছি কোথাও আছো তুমি। তাতে কি হলো ? ঠিক কোথায় আছো তা তো আর বুঝতে পারবে না।'

'পারবে। বার্চ আর পাইন-এর ছোট টুকরো দুটো দেখে ওর মনে আসবে : বার্চ আর পাইন গাছ আছে এমন কোনো বনে লুকিয়ে আছে অ্যালান। তখন ও চিন্তা করবে, কোথায় আছে এমন বন। এবং ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে একবার আসবে করিনাকিয়েগ-এ। আমি বলছি, ডেভিড, যদি ও না আসে আমার নাম বদলে রাখবো।'

'বুঝলাম, কিন্তু এত সব অনিশ্চয়তার ভেতর না গিয়ে ওর জানালায় একটা চিঠি রেখে আসলে হতো না ?'

'হতো না। সাকুল্যে দুই বছর পাঠশালায় গেছে ম্যাককল। চিঠি রেখে আসলে ওটা পড়ানোর জন্যে হয়তো শত্রুপক্ষের কারো কাছেই যেতে হবে ওকে।'

সে রাতেই চলে গেল অ্যালান। অদ্ভুতদর্শন আগুনে ক্রসটা জন ব্রেক ম্যাককলের জানালায় রেখে ঘণ্টা কয়েকের ভেতরই ফিরে এলো। বাকি রাতটুকু নিশ্চিন্তে ঘুমালাম।

পরদিন সকাল থেকে চারদিকে নজর রাখতে লাগলো অ্যালান, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে কেউ উঠে আসে কিনা। দুপুরের দিকে আশা পূর্ণ হলো ওর। উত্তেজিত ভঙ্গিতে ফিসফিসিয়ে ডাকলো আমাকে, 'দেখে যাও, ডেভিড ! আমার কথা ঠিক কি না।'

জোরে একবার শিস বাজালো ও। ঘুরে দাঁড়ালো ঢাল বেয়ে উঠে আসা লোকটা। কয়েক পা এগিয়ে এলো আমাদের দিকে। আবার শিস দিলো অ্যালান। আরো এগিয়ে এলো লোকটা।

বছর চল্লিশেক বয়েস হবে তার। মুখভর্তি দাড়ি, দেখে বুনো বুনো মনে হয়। গুটি বসন্তে বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা। শতছিন্ন একটা পোশাক পরনে। জঘন্য ইংরেজি বলে, তবু তাকে গেলিক-এ কথা বলতে দিলো না অ্যালান। জেমস স্টুয়ার্টের কাছে একটা খবর নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানালো ও। এক কথায় রাজি হলো ম্যাককল। খবরটা লিখে দিতে বললো অ্যালানকে। কারণ মুখে মুখে বলে দিলে নির্ঘাত ও ভুলে যাবে কি বলতে হবে।

কিন্তু বললেই তো আর লিখে দেয়া যায় না। এই বিজন-বিভুঁই জায়গায় কাগজ কলম কালি পাওয়া যাবে কোথায়? অ্যালানই সমাধান করলো সমস্যাটার। খুঁজে খুঁজে কলম বানানোর মতো একটা ঘুঘুর পালক জোগাড় করলো বন থেকে। ছুরি দিয়ে চেঁছে কলম বানালো সেটা দিয়ে। নদী থেকে পানি এনে তাতে বারুদ গুলে এক ধরনের কালি বানালো। তারপর ফরাশি সেনাবাহিনীর নিয়োগপত্রটার এক কোনা ছিঁড়ে লিখলো:

'প্রিয় ভাই,

'দয়া করে পত্রবাহকের কাছে টাকা দিয়ে দেবে। ও জানে আমি কোথায় আছি।

'তোমার স্নেহের

'এ. এস.'

চিঠি নিয়ে চলে গেল জন ব্রেক ম্যাককল।

তিন দিনের ভেতর কোনো খবর পেলাম না তার। তৃতীয় দিন

বিকেল পাঁচটার দিকে বনের ভেতর থেকে একটা শিসের আওয়াজ ভেসে এলো। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো অ্যালান। ওপরে উঠে এলো ম্যাককল। অ্যাপিনের খবরাখবর দিলো অ্যালানকে। সে জানালো, এর ভেতরে সারা অ্যাপিন তোলপাড় করে ছেড়েছে লাল কোর্তারা। বহু কৃষককে ধরে নিয়ে গেছে। এমন কি কয়েকজন চাকরসহ জেমস স্টুয়ার্টকেও বন্দী করা হয়েছে ফোর্ট উইলিয়াম-এ। ও টাকা নিয়ে ফেরার পর ধরেছে জেমসকে ওখানে শত্রু মিত্র সবার ধারণা অ্যালান ব্রেকই হত্যা করেছে কর্নিল ক্যাম্পবেলকে। অ্যালান ব্রেক আর নাম না জানা এক সতেরো বছর বয়েসী ছেলেকে ধরে দেয়ার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে একশো পাউণ্ড। খবরগুলো দেয়ার পর সবুজ রঙের ছোট্ট একটা থলে বের করে দিলো ম্যাককল।

থলেটা খুললো অ্যালান। চারটে সোনার গিনি আর কিছু খুচরো পাওয়া গেল তার ভেতর।

'মন্দের ভালো,' বললো ও। 'কিছু না-র চেয়ে চার গিনি অনেক ভালো, কি বলো, ডেভিড?' তারপর ম্যাককলের দিকে ফিরে বললো, 'আমার বোতামটা কই?'

'হারিয়ে ফেলেছি,' ভালো মানুষের মতো মুখ করে বললো ম্যাককল।

'কি!' চেঁচিয়ে উঠলো অ্যালান। 'ইয়াকির আর জায়গা পাওনি? জানো ওটা আমার বাবার দেয়া জিনিস? দেখ, জন ব্রেক, আমাকে বোকা ভেবো না। ও জিনিস যে তুমি হারাবে না তা আমার ভালোই জানা আছে। ভালো চাও তো দিয়ে দাও, নইলে ভবিষ্যতে ভুগতে হবে তোমাকে।'

ধমকে কাজ হলো। পোশাকের নিচ থেকে বোতামটা বের করে দিলো ম্যাককল। কেন যে ও এই মিথ্যাচারটুকু করলো তা আজও

রহস্যময় হয়ে আছে আমার কাছে। হয়তো ভেবেছিলো এ মুহূর্তে বেকায়দায় আছে অ্যালান, কিছু বলতে পারবে না। কিন্তু ভবিষ্যতে ভুগতে হবে বলে শাসানোয় ভয় পেয়ে দিয়ে দিয়েছে।

একটু পরে চলে গেল লোকটা। আবার পথে নামার জন্যে তৈরি হতে লাগলাম আমরা।

তেইশ

একটানা এগারো ঘণ্টা হেঁটে পাহাড় শ্রেণীর শেষ প্রান্তে পৌছুলাম। তখন কাক ডাকা ভোর। সামনে নিচু, এবড়োখেবড়ো, জনহীন প্রান্তর। ওটা পেরোতে হবে আমাদের। সূর্য খুব একটা ওপরে ওঠেনি, আমাদের চোখ সোজা জ্বল জ্বল করছে। হালকা কুয়াশার স্তর জমে আছে প্রান্তরের ওপর। ধোঁয়ার মতো দেখাচ্ছে। বেশি দূর দৃষ্টি যায় না তার ভেতর দিয়ে। ঐ কুয়াশার আড়ালে যদি বিশ দল অশ্বারোহী সৈনিক থাকে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

সুতরাং সত্যি সত্যি সৈনিক আছে কিনা না জেনে আপাতত আর এগোনোর ঝুঁকি নিতে চাইলাম না। একটা নিচু পাহাড়ের পাশে বসলাম দু'জন। খাবারের পুটুলিতে যে সামান্য খাবার অবশিষ্ট ছিলো, খেয়ে নিলাম। তারপর বসলাম রণ কৌশল ঠিক করতে।

'ডেভিড,' বললো অ্যালান, 'এবার সিদ্ধান্ত নাও, রাত পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করবে, না এগিয়ে যাবে?'

'আঁ, আমি ক্লান্ত সন্দেহ নেই কিন্তু এখনো, যদি প্রয়োজন হয়, যতটা হেঁটেছি আরো ততটা হাঁটতে পারবো।'

'হাঁটতে পারবে কি পারবে না সেটা জিজ্ঞেস করিনি, আমি জানতে

চাইছি এখন থামবো না এগিয়ে যাবো ? আমাদের এখনকার পরিস্থিতি হলো : অ্যাপিনে গেলে নিশ্চিত মৃত্যু। দক্ষিণে ক্যাম্পবেলদের এলাকা, ওদিকে যাওয়ার কথা ভাবাও যাবে না। উত্তরে কোনো দরকার নেই আমাদের। না তোমার, না আমার। তুমি চাও কুইন্সফেরিতে পৌছুতে, আমি চাই ফ্রান্সে। একমাত্র যেতে পারি পুবে।'

'হ্যাঁ, ঠিক।'

'কিন্তু পুব দিকের রাস্তা তো দেখছো, মরুভূমির চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। তার ওপরে আছে লাল-কোর্তাদের ভয়। বিস্তীর্ণ প্রান্তর, চারদিকে উঁচু পাহাড় ; কোনো একটার চূড়ায় উঠে তাকালেই দেখতে পাবে দু'জন মানুষ হেঁটে চলেছে। রাতেও একই অবস্থা। আকাশে চাঁদ থাকে।'

'দেখা যাচ্ছে রাত দিন দুটোই সমান,' বললাম আমি। 'তাহলে আর রাতের জন্যে বসে থেকে লাভ কি ? চলো রওনা হই।'

অ্যালান খুশি হলো আমার সিদ্ধান্ত শুনে। মুখ তুলে তাকালো সামনে। আমিও তাকালাম। বেশ খানিকটা উঠে এসেছে সূর্য। কুয়াশা মিলিয়ে গেছে। যতদূর চোখ যায় ধূ-ধূ মরুভূমির মতো বিছিয়ে আছে প্রান্তরটা। জন মানুষের চিহ্নও নেই। উঁচু নিচু পাথুরে জমি। মাঝে মাঝে দু-একটা ঝোপ। অনেক দূরে কয়েকটা মরা পাইন গাছ কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে আছে। সব মিলিয়ে হতাশাজনক একটা দৃশ্য। তবে সবচেয়ে স্বস্তির কথা, লাল-কোর্তা নেই ওখানে।

রওনা হলাম আমরা পাথুরে প্রান্তরের ওপর দিয়ে। দূরে হলেও চারদিকে উঁচু পাহাড়। ওসব পাহাড়ের ওপর থেকে যেন দেখা না যায় সেজন্যে ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে থেকে অথবা বেশি উঁচু নিচু এলাকা দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। ফলে পরিশ্রম করতে হচ্ছে

প্রচণ্ড। কখনো নিচু হয়ে, কখনো হাঁটু গেড়ে কখনো বা পুরো দস্তুর হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হচ্ছে। সোজা হয়ে চলার কথা ভাবতেও ভয় লাগছে। ঘেমে নেয়ে উঠেছি। ক্লান্তিতে হাত-পা আর চলতে চাইছে না।

অবশেষে দুপুর নাগাদ বড়সড় একটা ঝোপের কাছে পৌঁছুলাম। কুকুরের মতো হাঁপাচ্ছি দু'জন।

'এবার একটু জিরিয়ে নি,' বললো অ্যালান। 'তুমি শুয়ে পড়ো, আমি পাহারায় থাকছি। পরে তোমাকে জাগিয়ে দিয়ে আমি শোবো।'

বিনা বাক্যব্যয়ে শুয়ে পড়লাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে গেলাম। ঘণ্টাদুয়েক পরে অ্যালান যখন জাগালো তখন মনে হলো, ঠিক মতো ঘুম আসার আগেই আমাকে উঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

আমাদের কাছে কোনো ঘড়ি নেই। মাটিতে একটা কাঠি পুঁতলো অ্যালান। একটু দূরে একটা দাগ টেনে বললো, 'কাঠির ছায়া যখন এ পর্যন্ত আসবে তখন জাগিয়ে দিও আমাকে।'

ঘাড় কাত করে সম্মতি দিলাম। শুয়ে পড়লো অ্যালান। তক্ষুণি ঢলে পড়লো ঘুমের কোলে। কিছুক্ষণ বসে রইলাম আমি মাটিতে পোঁতা কাঠি আর তার ছায়ার দিকে চেয়ে। তারপর কখন যে ঝিমুনি এসেছে, আর কখন যে অ্যালানের পাশে গুটি সুটি হয়ে শুয়ে পড়েছি টেরও পাইনি।

যখন ঘুম ভাঙলো ধড়মড় করে উঠে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল আমাকে কি দায়িত্ব দিয়েছিলো অ্যালান। ঝট করে চোখ ফেরালাম কাঠি আর ছায়ার দিকে। সর্বনাশ, কোথায় ছায়া? সূর্য দেখার চেষ্টা করলাম। প্রথমে সারা আকাশের কোথাও তার দেখা পেলাম না। পশ্চিম দিগন্তের দিকে চোখ পড়তে দেখলাম, লাল থালার

মতো চেহারা নিয়ে ডুবে যাচ্ছে সেটা। ভয়ে লজ্জায় মাথা ঘুরে ওঠার দশা হলো আমার। অ্যালানকে মুখ দেখাবো কি করে? প্রান্তরের চারপাশে একবার চোখ বুলালাম। দক্ষিণ পূর্ব কোনায় দৃষ্টি পড়তেই ধক করে উঠলো হৃৎপিণ্ডের ভেতর। ঘোড়-সওয়ার সৈনিকদের একটা দল এগিয়ে আসছে। এখনো বেশ দূরে, তবে বড় ঝোপঝাড়গুলো পরীক্ষা করতে করতে আমাদের দিকেই আসছে।

আস্তে ঠেলা দিয়ে অ্যালানকে জাগালাম। প্রথমেই ওর চোখ পড়লো ঘোড়-সওয়ারদের ওপর। তারপর কাঠি, আর দাগের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেগ ফুটে উঠলো অ্যালানের চেহারায়।

'এখন কি হবে?' শঙ্কিত গলায় প্রশ্ন করলাম আমি।

'কি আর? লুকোচুরি খেলবো,' বললো অ্যালান, আমি যে মারাত্মক এক অপরাধ করে ফেলেছি তা ওর মনেও পড়লো না। 'ঐ পাহাড়টা দেখছো?' উত্তর-পূর্ব দিগন্তের দিকে ইশারা করলো ও।

'হ্যাঁ।'

'ওটার নাম বেন অ্যালভার। ওখানে পৌঁছুতে হবে আমাদের। অনেক গুহা আছে ঐ পাহাড়ে, কোনোমতে একবার পৌঁছুতে পারলে লুকানোর জায়গার অভাব হবে না।'

'কিন্তু, অ্যালান, ঐ ঘোড়সওয়ারদের সামনে দিয়েই তো যেতে হবে, ওরা দেখে ফেলবে না?'

'জানি, ডেভিড। কিন্তু এ ছাড়া কোনো উপায় নেই, ঝুঁকিটা নিতে হবে। ওরা হয়তো খেয়াল করবে না। তাছাড়া এখনো অনেক দূরে ওরা। খেয়াল করলেও ওরা পৌঁছুনোর আগেই আমরা পৌঁছে যাবো ওখানে। চলো!'

বলেই হাত আর হাঁটুতে ভর দিয়ে অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে ছুটতে শুরু

করলো ও। আমাকেও ছুটতে হলো ওর অনুকরণে। ভঙ্গিটা যত অদ্ভুতই হোক না কেন, বেশ দ্রুত ছুটছে অ্যালান। ওর গতির সাথে তাল রাখতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি আমি। এঁকে বেঁকে নিচু জায়গা দিয়ে ছোটার চেষ্টা করছে ও। তাতে আরো সমস্যা হচ্ছে। কিছুক্ষণের ভেতর হাতের তালু আর হাঁটুতে প্রচণ্ড ব্যথা হয়ে গেল। আরও কিছুক্ষণের ভেতর ছড়ে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগলো। কিন্তু থামলাম না আমরা। থামলে এমনিতে মরবো, তার চেয়ে এভাবে যদি মরি ক্ষতি নেই। নাকে, চোখে, গলায় ধুলো ঢুকে খুস খুস করছে, পানি বেরিয়ে আসছে, হাঁচি আসছে। কোনো কিছুর তোয়াক্কা করছি না। জানি সময় মতো ঐ পাহাড়ে পৌঁছুতে না পারলে মৃত্যু অবধারিত, তাই দুনিয়ার আর কোনো দিকে মন না দিয়ে একাগ্রচিত্তে হামাগুড়ি দিয়ে ছুটে চলেছি।

দেখতে দেখতে অস্তায়মান সূর্যের আলোয় লাল হয়ে গেল চারদিক। একটু একটু করে কমতে কমতে এক সময় মিলিয়ে-ও গেল সে আলো। অন্ধকার নেমে এলো প্রকৃতিতে। প্রায় পৌঁছে গেছি আমরা পাহাড়টার কাছে।

এই সময় কানের কাছে অ্যালানের ফিসফিস আওয়াজ শুনলাম, 'থামো!'

প্রচণ্ড ক্লান্তিতে এমন বিকল হয়ে গেছে মন যে প্রথমে বুঝতেই পারলাম না শব্দটা কিসের? এর অর্থ কি।

'থামো! হয়েছে আর ছুটতে হবে না,' আবার বললো অ্যালান। এবার কথাটার অর্থ ধরতে পারলো মস্তিষ্ক। থেমে পড়লাম আমি।

ঠিক তক্ষুণি শুনতে পেলাম ট্রাম্পেটের শব্দ। চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম পেছন দিকে। না, আমাদের দেখেনি ঘোড়-সওয়াররা।

নিজেদের প্রয়োজনেই ট্রাম্পেট বাজিয়েছে। দেখলাম, এক জায়গায় জড় হতে শুরু করেছে সৈনিকরা। একটু পরেই আগুন জ্বাললো তারা প্রান্তরের মাঝামাঝি জায়গায়। রাতের মতো আস্তানা গাড়লো সেখানে।

সুযোগ পেয়ে অ্যালানকে বললাম, 'এবার তো আমরাও একটু ঘুমিয়ে নিতে পারি!'

'উঁহুঁ,' বললো অ্যালান, 'আজ রাতে কোনো ঘুম নেই। ঘোড়-সওয়াররা বিশ্রাম নিতে থাকুক, এই ফাঁকে বেন অ্যালডার-এর যতখানি সম্ভব ভেতরে চলে যেতে হবে আমাদের। রাত শেষ হওয়ার আগেই ভালো একটা লুকোনোর জায়গাও খুঁজে বের করতে হবে।'

'অ্যালান,' হতাশ গলায় বললাম আমি, 'সত্যি বলছি, আমার ইচ্ছার কোনো অভাব নেই, অভাব শক্তির। আর এক পা-ও এগোতে পারবো না আমি!'

'ঠিক আছে, আমি তোমাকে কাঁধে করে নিয়ে যাবো।'

ওর মুখের দিকে তাকালাম, ঠাট্টা করছে নাকি? কিন্তু না, মুখ দেখে তা মনে হলো না। একটু ভাবলাম আমি। অসম্ভব, প্রাণ থাকতে ওর কাঁধে চড়ে যাবো না। বললাম—

'ঠিক আছে এগোও।' আমি যাচ্ছি।'

প্রশংসার একটা হাসি উপহার দিলো অ্যালান। যেন বলতে চাইলো, 'এই তো চাই, ডেভিড!' তারপর আর সময় নষ্ট না করে ছুটতে শুরু করলো।

আমার তখনকার অনুভূতির কথা লিখে প্রকাশ করার সামর্থ্য আমার নেই। ভালো মনেও নেই, আসলে কেমন অনুভব করছিলাম। শুধু মনে আছে কেমন একটা ঘোরের ভেতর দিয়ে অনুসরণ করছি অ্যালান

নামের একটা লোককে। প্রতিবার পা ফেলার সময় মনে হচ্ছে, এবারই শেষ, পরের পদক্ষেপে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবো। কিন্তু আশ্চর্য! পড়ে তো গেলামই না, উপরন্তু এক মুহূর্ত বিশ্রাম না নিয়ে হেঁটে গেলাম সারা রাত।

অবশেষে রাত শেষ হলো। দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে। বেন অ্যালডার পাহাড়শ্রেণীর অনেক ভেতরে চলে এসেছি আমরা। বিপদ কেটে গেছে। ইতিমধ্যে আমাদের যে অবস্থা হয়েছে তা বর্ণনাতীত। থুত্থুরে দুই বুড়ো বা সবে হাঁটতে শিখছে এমন দুই বাচ্চার মতো টলতে টলতে, হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে চলেছি। মুখ ফ্যাকাশে, চোখ দুটো আগুনের মতো লাল। কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি এ-সম্পর্কে কোনো বোধ নেই। আমি, অ্যালান—দু'জনেরই এক অবস্থা।

ঝোপঝাড়ে ছাওয়া এক উপত্যকার ওপর দিয়ে হাঁটছি আমরা। অ্যালান আগে। এক কি দু'পা পেছনে আমি। হঠাৎ একটা ঝোপ নড়ে উঠলো প্রবল ভাবে। সেটার আড়াল থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো তিন চারজন ছেঁড়া-খোঁড়া পোশাক পরা মানুষ। পরমুহূর্তে চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম আমরা। দু'জনেরই গলায় চেপে বসেছে একটা করে দীর্ঘ ছোরা।

কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না আমার ভেতর। কোনো ধস্তাধস্তি করলাম না। কোনো ব্যথা অনুভব করলাম না। গলায় ছুরি চেপে বসা কিছু না, আর হাঁটতে হচ্ছে না, এতেই আমি খুশি। আমাকে চেপে ধরেছে যে লোকটা তার দিকে তাকালাম। রোদে পোড়া কালো একটা মুখ। চোখ কটমটিয়ে তাকিয়ে আছে। কিন্তু একটুও ভয় পেলাম না আমি। শুনলাম অ্যালান আর একজন হামলাকারী ফিস-

ফিসিয়ে আলাপ করছে গেলিক ভাষায়।

একটু পরেই ছোরা সরে গেল আমাদের গলা থেকে। আমাদের অস্ত্রগুলো নিয়ে নেয়া হলো। মুখোমুখি বসলাম আমি আর অ্যালান। হামলাকারীদের একজন উঠে হাঁটতে শুরু করলো। বাকিরা বসে রইলো আমাদের ঘিরে।

'ক্লানির লোক এরা,' বললো অ্যালান। 'মন্দের ভালো। আপাতত এখানে বসে থাকতে হবে আমাদের। একজন গিয়ে ক্লানিকে জানাবে আমার আসার খবর।'

ক্লানি ম্যাকফারসন ভোরিচ গোত্রের প্রধান। ছ'বছর আগে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দায়ে অভিযুক্ত করা হয় তাকে। জীবিত বা মৃত ধরিয়ে দিতে পারলে পুরস্কার দেয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়েছিলো। আমার ধারণা ছিলো অনেকদিন আগেই ও ফ্রান্সে পালিয়ে গেছে। এখন অ্যালানের মুখে এ কথা শুনে শত ক্লান্তির মাঝেও বিস্ময় ফুটে উঠলো চোখে।

'কি!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'ক্লানি এখনো দেশে আছে?'

'হ্যাঁ,' বললো অ্যালান, 'এখনো দেশে আছে, এবং নিজের এলাকায়-ই আছে। রাজা জর্জের সাধ্যও নেই ওর কিছু করে।'

আরো কিছু জিজ্ঞেস করবো, ভাবলাম আমি। কিন্তু তার আগেই অ্যালান বললো, 'উহ, ভীষণ ক্লান্ত লাগছে, একটু ঘুমিয়ে নিই।' ব্যস আর কোনো কথা নেই, ঘুমিয়ে গেল ও।

কিন্তু আমার ঘুম এলো না। মাটিতে শুয়ে শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে লাগলাম, আর নোংরা লোকগুলোর গেলিক ভাষায় আলাপ শুনতে লাগলাম।

দুপুর নাগাদ ফিরে এলো সেই লোকটা ক্লানির কাছ থেকে খবর

নিয়ে। জানালো, তার গোত্রপতি খুব খুশি হবে অ্যালানের মতো লোককে স্বাগত জানাতে পারলে। সঙ্গে করে আমাদের জন্যে কিছু খাবার পাঠিয়ে দিয়েছে ক্লানি। খেয়ে নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলাম আমরা।

চব্বিশ

অবশেষে ক্লানির আস্তানায় পৌঁছুলাম। পাহাড়ের পাদদেশে অদ্ভুত চেহারার একটা বাড়ি। চারপাশে ঘন বন, মাঝখানে এক টুকরো ফাঁকা জায়গায় বাড়িটা। পাহাড়ের খাড়া গা একটা দেয়ালের কাজ করছে। অন্য দেয়ালগুলো তৈরি কাঠের বাতা দিয়ে। ওপরে মসের আচ্ছাদন। অনেকটা ডিমের মতো চেহারা। ক্লানির অনেকগুলো গোপন আস্তানার একটা এটা। এ এলাকায় বাড়িটা পরিচিত ক্লানির খাঁচা নামে।

'স্বাগতম, মিস্টার স্টুয়ার্ট,' দরজায় দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালো ক্লানি। 'এসো, ভেতরে এসো। তোমার বন্ধুকেও নিয়ে এসো। কি যেন নাম ওর?'

'ডেভিড ব্যালফোর, শ বাড়ির ছেলে,' বললো অ্যালান। 'কেমন আছো তুমি, ক্লানি?'

'ভালো ভালো। এসো ভেতরে এসো, তারপর কথা হবে।'

ভেতরে ঢুকে তিনটে গ্লাসে ব্র্যাণ্ডি ঢাললো ক্লানি। অ্যালান আর আমার দিকে দুটো গ্লাস এগিয়ে দিয়ে নিজে নিলো অন্যটা। তারপর বললো, 'এসো তোমার ফিরে আসা উপলক্ষে পান করি।'

তিনটে গ্লাস এক জায়গায় হলো। ব্র্যাণ্ডিতে চুমুক দিলাম আমরা। ব্র্যাণ্ডিটুকু খাওয়ার প্রায় সাথে সাথে আমি চাঙা হয়ে উঠলাম। ভালো করে তাকালাম ঘরটার চারপাশে। বাইরে থেকে যেমন দেখতে ভেতরেও তেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে সাজানো আসবাবপত্র।

একটু পরে খেতে ডাকলো আমাদের ক্লানি। ঝলসানো মাংসের ওপর লেবুর রস ছিটিয়ে পরিবেশন করা হলো। কেন জানি না বেশ খিদে থাকা সত্ত্বেও খুব একটা খেতে পারলাম না আমি।

খাওয়ার পর বহু ব্যবহারে জীর্ণ তাস বের করলো ক্লানি। আমার দিকে তাকালো।

'এসো খেলা যাক,' বললো সে।

ছোট বেলা থেকে জেনে এসেছি তাস খেলা খারাপ। ভদ্রলোকের করণীয় অকরণীয় সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে গিয়ে বাবা একদিন বলেছিলেন, 'জীবনে কখনো তাস খেলবে না, ডেভিড।'*

সুতরাং ক্লানির প্রস্তাব শোনা মাত্র ক্লান্তির অজুহাত দেখালাম আমি। বললাম, 'কিছুতেই এখন খেলতে পারবো না। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।'

খুব অবাক হলো ক্লানি। একটু ক্ষুব্ধও। তাস খেলার প্রস্তাব, বিশেষ করে তার দেয়া প্রস্তাব কেউ প্রত্যাখ্যান করতে পারে তা যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না।

অ্যালান বুঝলো আমার সমস্যাটা। ও তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললো, 'সত্যিই ও ক্লান্ত, ক্লানি। ও খেলতে পারবে না। কিন্তু আমি খেলবো। তুমি তাস বাঁটো।'

অ্যালানের কথায় সন্তুষ্ট হলো না ক্লানি। বললো, 'আমার গরীব-

* এখানে বলা দরকার, সেযুগে তাস খেলা মানেই ছিলো জুয়া খেলা।

খানায় যা খুশি করার অধিকার আছে অতিথিদের। তোমার বন্ধু ইচ্ছে করলে মাথার ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, আমি কিছু বলবো না।'

বুঝলাম রেগে গেছে লোকটা। আমার জন্যে এই দুই বন্ধুর ভেতর মনোমালিন্য হোক তা চাই না। তাই আবার মুখ খুলতে হলো আমাকে। বললাম, 'স্যার, সত্যিই বলছি, আমি ক্লান্ত। আর বেশি কি বলবো, আপনার নিশ্চয়ই ছেলে আছে, আপনি বুঝবেন আশা-করি, আমার বাবাকে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম···।'

'ব্যস ব্যস হয়েছে, আর বলতে হবে না।' ঘরের কোনায় একটা বিছানার দিকে ইশারা করলো ক্লানি। 'যাও শুয়ে পড়ো।'

লোকটা এখনো ক্ষেপে আছে কিনা মুখ দেখে বুঝতে পারলাম না। যা হোক কথা না বাড়িয়ে শুয়ে পড়লাম আমি। অ্যালান আর ক্লানি বসে গেল তাস নিয়ে। প্রায় সারা রাত খেললো ওরা। প্রথম থেকেই জিতছে অ্যালান। শেষ রাতের দিকে একবার ঘুম ভাঙতে দেখলাম ওর সামনে গিনির একটা স্তূপ হয়ে উঠেছে। কম পক্ষে একশোটা হবে।

দ্বিতীয় দিন ভাগ্য বদলে গেল। হারতে শুরু করলো অ্যালান। দুপুরের কিছু পরে আমার কাছে ধার চাইলো ও।

'কেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'কেন আবার কি? ধার হিশেবে দেবে।'

'কিন্তু কেন?' আবার জিজ্ঞেস করলাম। 'আমি তো কোনো···।'

'ডেভিড! তুমি দেবে না আমাকে ধার?'

আর কথা না বাড়িয়ে একটু রুষ্ট মনেই আমি আমার গিনি দুটো দিয়ে দিলাম ওকে।

তৃতীয় দিন সকালে ঝরঝরে শরীর নিয়ে ঘুম থেকে উঠলাম আমি।

গায়ের ব্যথা সম্পূর্ণ সেরে গেছে। আজ খিদেও লেগেছে বেশ ভালো ভাবে।

খেয়ে দেয়ে ক্লানির খাঁচার বাইরে এলাম। চমৎকার রোদ ঝলমলে সকাল। চারদিক শান্ত। মাঝে মাঝে ক্লানির চর আর ভৃত্যরা আসছে খবরাখবর, খাবারদাবার নিয়ে। কিছুক্ষণ মুক্ত হাওয়া খেয়ে আবার ঢুকলাম খাঁচায়। এতক্ষণে খেলা শেষ হয়েছে অ্যালান আর ক্লানির। কারণ অ্যালানের কাছে আর পয়সা নেই। সব হেরে গেছে সে। আমাকে দেখেই গেলিক-এ কি যেন বললো ক্লানি।

'আমি গেলিক বুঝি না, স্যার।'

আমি যে তার সঙ্গে তাস খেলিনি সে কথা বোধহয় এখনো ভুলতে পারেনি ক্লানি। তাই আমার প্রতিটা কথায় আপত্তি করার মতো কিছু একটা খুঁজে পাচ্ছে সে। ঝামটে উঠলো, 'গেলিক জানো না! তাহলে জানোটা কি, অ্যাঁ? তোমার নামটাই তো চমৎকার গেলিক। যাকগে, যা বলছিলাম, আমার চররা খবর এনেছে, দক্ষিণের পথ পরিষ্কার। এখন বলো, যাওয়ার মতো শক্তি ফিরে এসেছে তোমার গায়ে?'

'বোধহয় এসেছে,' গম্ভীর গলায় জবাব দিলাম আমি। 'কিন্তু যাবো কি করে? আমাদের কাছে কোনো টাকা নেই এখন।'

'দূর, টাকার কথা ভেবো না, তোমার বন্ধু যা হেরেছে সব ফেরত দিয়ে দেবো। যত যা-ই হোক তোমরা আমার অতিথি।'

অ্যালান কিছু বললো না। অপরাধী ভঙ্গিতে মুখ নিচু করে রইলো। নিজেরগুলোর সাথে সাথে আমার টাকাগুলোও খুইয়েছে ও।

'আমার সঙ্গে একটু বাইরে আসবেন, স্যার?' ক্লানিকে বললাম। অ্যালানের ওপর প্রচণ্ড রাগে ফুসছি আমি ভেতরে ভেতরে।

এলো ক্লানি। আমি আবার বললাম, 'প্রথমেই আপনার সহৃদয়তার জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছি···।'

'দূর দূর, সহৃদয়তা আবার কোথায় দেখলে। আমি শুধু কর্তব্য করেছি। যাক, আসল কথাটা কি, বলে ফেল দেখি তাড়াতাড়ি।'

'হ্যাঁ, টাকাটা আপনি ফেরত দিতে পারবেন না। আমরা হারলে আপনি টাকা ফেরত দিয়ে দেবেন, আর আমরা জিতলে সুন্দর থলে ভরে নিয়ে যাবো আপনার টাকা, তা কি করে হয়?'

চুপ করে রইলো ক্লানি। একটু লালচে আভা ধরেছে তার মুখ।

'আমার বয়েস কম,' আবার বললাম আমি, 'আপনার পরামর্শ চাইছি। আপনার ছেলেকে যে পরামর্শ দিতেন আমাকেও তাই দেবেন। আমার বন্ধু আপনার অনেকগুণ বেশি টাকা জিতেছিলো প্রথমে, পরে সব হেরে গেছে। এর ভেতরে কোনো ছলচাতুরী ছিলো না। এখন আমি কি ফেরত নেবো সেই টাকা? আমার আত্মসম্মানে বাধবে না?'

এবারও কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো ক্লানি। তারপর বললো, ঠিকই বলেছো, মিস্টার ব্যালফোর। আমি হলেও নিতে পারতাম কিনা সন্দেহ।'

'এখানে একটা কথা বলতে চাই, স্যার,' সুযোগ পেয়ে বললাম আমি, 'যা-ই বলেন না কেন জুয়া খেলা এত জঘন্য একটা ব্যাপার, কোনো ভদ্রলোকের উচিত না এতে যোগ দেয়া।'

'ঠিকই বলেছো।' আবার চুপ করে গেল ক্লানি। অবশেষে বললো, 'সত্যিই, মিস্টার ব্যালফোর, তোমার মতো ছেলেদের ভেতর আজকাল আর এমন দৃঢ় আত্মসম্মানবোধ দেখা যায় না। আমি মুগ্ধ হয়েছি তোমার আচরণে পুত্র ভেবে টাকাগুলো তোমাকে দিচ্ছি। এর সঙ্গে আমার আশির্বাদও থাকবে। নেয়া না নেয়া তোমার ইচ্ছা।'

পঁচিশ

রাতের অন্ধকারে ক্লানির খাঁচা ছেড়ে বেরোলাম আমরা। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এক ভৃত্য।

নিঃশব্দে হাঁটছি আমি আর অ্যালান। পাশাপাশি নয়। অ্যালান সামনে, আমি পেছনে। দু'জনেই রেগে আছি। আমার রাগের সাথে মিশে আছে অহঙ্কার, আর অ্যালানের রাগের সাথে লজ্জা। আমার অহঙ্কার : শেষ পর্যন্ত আমার ধারণাকেই সঠিক বলে মেনে নিয়েছে ক্লানি। অ্যালানের লজ্জা : আমার টাকা হেরে গেছে ও।

ক্লানির খাঁচা ছাড়ার পরই চিন্তা প্রবল হয়ে উঠেছে আমার মনে : এবার বোধহয় যার যার পথ দেখা উচিত। আমার মনের একটা অংশ দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছে চিন্তাটাকে। কিন্তু অন্য একটা অংশ কিছুতেই মানতে পারছে না এ অভিমত। সত্যি কথা বলতে কি, আমাকে বাঁচানোর জন্যে, আমার নিরাপত্তার জন্যে কম করেনি অ্যালান। বিশেষ করে ক্যাপ্টেন হোসিসনের খপ্পর থেকে বাঁচার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় অবদান তো ওরই। এখন একটু চটেছি বলেই ওকে ফেলে চলে যাবো তা কি করে হয়। অন্য দিকে মনের

ক্ষুব্ধ অংশের যুক্তিও কম প্রবল নয়। কেন এমন চোরের মতো পালাতে হচ্ছে আমাদের? লাল-কোর্তারা মূলতঃ কাকে খুঁজছে? কেন খুঁজছে? কার বিপদ বেশি? দেখা যাচ্ছে সবগুলো প্রশ্নের জবাবের সাথেই অ্যালান জড়িত। অ্যালানের জন্যেই এমন-চোরের মতো পালাতে হচ্ছে। লাল-কোর্তারা মূলতঃ অ্যালানকেই খুঁজছে। কারণ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এমন একজনের বিশ্বস্ত অনুচর ও। সুতরাং অ্যালানের কাছ থেকে আলাদা হলেই আমার বিপদের পরিমাণ কমে চলে আসবে প্রায় শূন্যের কোঠায়।

ভাবতে ভাবতে হাঁটছি, কিন্তু ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না, কি করবো।

'ডেভিড,' এমন সময় বললো অ্যালান, 'ছোট্ট একটা ঘটনা নিয়ে বন্ধুর সাথে এমন আচরণ করা উচিত নয়। যা ঘটে গেছে সেজন্যে আমি দুঃখিত। এবং সে কথা বলেছি তোমাকে। এখন তোমার যদি কিছু বলার থাকে, বলো।'

'আমার কিছু বলার নেই!'

শুনে একটু যেন মিইয়ে গেল ও। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললো, 'সব কিছুর জন্যে আমাকে দোষী করছো কেন?'

'তাহলে আর কাকে ভাববো? তোমার জন্যেই আমাকে ভিক্ষুকের মতো হাত পাততে হলো এক অপরিচিত লোকের কাছে।'

ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো অ্যালান। 'তাহলে কি এবার আমরা আলাদা হবো? দেখ, ডেভিড, এখানে প্রচুর পাহাড় আর ঝোপ জঙ্গল আছে। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে তোমার দেশে না গেলেও চলবে আমার।'

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা পড়লো যেন। আমার মনে যে আলাদা

হওয়ার চিন্তা চলছে তা কি টের পেয়ে গেছে ও ?

'অ্যালান ব্রেক !' চিৎকার করে উঠলাম আমি। 'ভেবো না আমি দুঃসময়ে বন্ধুর দিকে পিঠ ফিরিয়ে দিই।'

'আমিও দিই না। নিশ্চয়ই তার প্রমাণও দিয়েছি।'

'হ্যাঁ, কিন্তু তবু এমন কিছু কাজ তুমি করেছো যা কেউ অন্তত বন্ধুর সাথে করে না। সে সব আমি কোনো দিন ভুলতে পারবো না।'

'তুমি ভুলতে পারো আর না-ই পারো, ডেভিড,' শান্ত গলায় বললো অ্যালান, 'একটা কথা তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই, আমার প্রাণের জন্যে তোমার কাছে ঋণী আমি। আর এবার ঋণী হলাম টাকা নিয়ে। আমার এই ঋণের বোঝা আর বাড়াতে চাই না।'

রেগে গেলে মানুষ প্রতিপক্ষের প্রতিটা কথারই ভুল অর্থ করার জন্যে তৈরি হয়ে থাকে। আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না।

'তুমি আমাকে বলতে বলেছিলে,' শুরু করলাম আমি, 'তাহলে শোনো, তুমি অত্যন্ত জঘন্য আচরণ করেছো আমার সাথে। তোমার কারণে, হ্যাঁ, অ্যালান, তোমার কারণে মানুষের কাছে হাত পাতার মতো অপমানজনক কাজ করতে হয়েছে আমাকে। কিন্তু সেজন্য তোমাকে কখনো দোষারোপ করিনি। আর তুমি আমাকেই এখন দোষ দিচ্ছো ! কারণ আমি অপমানিত হয়েও মনের আনন্দে থেই থেই করে নাচতে পারি না। এর পর নিশ্চয়ই তুমি আশা করবে হাঁটু গেড়ে বসে ধন্যবাদ জানাবো তোমাকে !'

'হয়েছে থাক,' বললো অ্যালান। একটু যেন রুক্ষ ওর কণ্ঠস্বর। 'আর বলো না। যথেষ্ট হয়েছে।'

আবার আগের মতো নিরবে পথ চলছি আমরা। এমনি নিরবেই

পৌঁছুলাম গন্তব্যে। খাওয়া দাওয়া করলাম। তারপর শুয়ে পড়লাম। একটা কথা বললাম না কেউ কারো সাথে।

ক্লানির ভৃত্য, আমাদের পথ প্রদর্শক পরদিন সন্ধ্যা নাগাদ লক র‍্যানক-এ পৌঁছে দিলো আমাদের। এখান থেকে বিদায় নিলো সে। লোকটা বিদায় নেয়ার পরপরই আবহাওয়া খারাপ হতে লাগলো। মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ। বৃষ্টি শুরু হলো একটু পরে। বৃষ্টির ভেতরই এগিয়ে চললাম আমি আর অ্যালান।

দু'দিন একটানা হাঁটলাম। মাঝখানে কয়েকবার কিছুক্ষণের জন্যে থেমে বিশ্রাম নিয়ে নিয়েছি। এই পুরো সময়টায় অস্বাভাবিক ভালো ব্যবহার করেছে অ্যালান আমার সাথে। যদিও কথা বলেনি তবে সব সময় সাহায্য করার চেষ্টা করেছে। আর আমি অত্যন্ত যত্নের সাথে রাগ পুষেছি মনে। পুরোপুরি উপেক্ষা করেছি ওকে। যতবারই কিছু সাহায্য করতে চেয়েছে রূঢ় ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছি। এমনভাবে তাকিয়েছি যেন ও নিছক একটা ঝোপ বা পাথর।

দ্বিতীয় দিন শেষরাতে খোলামেলা একটা পাহাড়ের কাছে পৌঁছুলাম আমরা। বৃষ্টি এখনো চলছে। দিনের বেলায় এই পাহাড়ী এলাকা দিয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে যাওয়ার আশা বৃথা। সামনের দিনটা কাটানোর জন্যে একটা আশ্রয়ের খোঁজ করতে লাগলাম।

আশ্রয়ের সন্ধান পেতে পেতে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। বৃষ্টি কমে গেছে, যদিও একদম থামেনি। উদ্বিগ্ন চোখে আমার দিকে তাকালো অ্যালান।

'তোমার পুটুলিটা আমার কাছে দিতে পারো ইচ্ছে করলে।' ক্লানির ভৃত্য বিদায় নেয়ার পর এই নিয়ে নয় বার বললো ও কথাটা।

'ধন্যবাদ, আমি নিজেই পারছি,' আমি জবাব দিলাম।

মুহূর্তের জন্যে একবার জ্বলে উঠলো অ্যালানের চোখ দুটো। 'এই শেষবারের মতো বললাম। আমি খুব ধৈর্যশীল লোক নই, ডেভিড।'

'ছি-ছি! তুমি ধৈর্যশীল অমন কথা কখনো আমি বলেছি?' বিদ্রূপ আমার কণ্ঠস্বরে।

কোনো জবাব দিলো না অ্যালান। কিন্তু ওর আচরণই জবাব দিয়ে দিলো ওর হয়ে। মাথার হ্যাটটা একটু উঁচু করে দিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে এমন ভঙ্গিতে শিস দিতে দিতে হাঁটতে শুরু করলো। মাঝে মাঝে টিটকারির হাসি হেসে আড়চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে। সেই হাসি দেখে পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে আমার।

তৃতীয় রাতে ব্যালকহিডার অঞ্চলের পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছে গেলাম আমরা। তখন ভোর হচ্ছে। আকাশ পরিষ্কার। আবহাওয়া ঠাণ্ডা। বাতাসে হিমের গন্ধ। ক্লান্তির শেষ দশায় পৌঁছে গেছি আমি। সারা শরীরে ব্যথা। ঠাণ্ডায় কাঁপছি ঠকঠক করে। এমন কি কানেও ঠিকমতো শুনতে পাচ্ছি না। এদিকে এখনও আমাকে টিটকারি মেরে চলেছে অ্যালান। এখনো সেই একই হাড় পিত্তি জ্বালানো হাসি হাসছে আর উল্টা পাল্টা বলছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষেপাচ্ছে যে শব্দটা বলে তাহলো 'হুইগ,' যেন হুইগ হাওয়াটা কি এক জঘন্য ব্যাপার। হয়তো বলছে, 'ঐ পাথরটার ওপর দিয়ে লাফিয়ে যেতে পারবে, হুইগি? পারবে না! আমার ধারণা ছিলো চমৎকার লাফাতে পারো তুমি।' এমন আরো অনেক কথা হুল ফোটানো চলছে সমানে।

মনে মনে রাগ হচ্ছে, কিন্তু কিছু বলছি না। আসলে বলতে পারছি না। অতি কষ্টে সংযত রেখেছি নিজেকে। জানি এখন কিছু বলতে গেলেই ফেটে পড়বো আমি। হয়তো হাতাহাতি হয়ে যাবে অ্যালানের সঙ্গে।

খুব বেশিক্ষণ অবশ্য অমন অপমান সহ্য করে নির্বিকার থাকতে পারলাম না। আর একবার হুইগ বলতেই আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম।

'মিস্টার স্টুয়ার্ট,' চিবিয়ে চিবিয়ে বললাম, 'আমার চেয়ে বয়েস বেশি তোমার। ভদ্রতা বলে কিছু শেখোনি নাকি?'

থেমে দাঁড়ালো অ্যালান-ও। মাথার হ্যাটটা একটু উঁচু করলো। আস্তে আস্তে হাত দুটো ঢোকালো ব্রিচেসের পকেটে। মাথাটা সামান্য কাত হলো এক দিকে, চোখ দুটো ছোট ছোট। পাতলা একটা হাসি খেলে গেল দুই ঠোঁটের ওপর দিয়ে। তারপর শিস দিয়ে উঠলো একটা জাকবাইট গানের সুরে। প্রেসটোনপ্যানস-এ জেনারেল কোপ-এর পরাজয় নিয়ে ব্যঙ্গ করে রচিত হয়েছিলো গানটা। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল, সেই যুদ্ধে রাজকীয় পক্ষে লড়েছিলো অ্যালানও।

'এই সুরে শিস দিলে কেন, মিস্টার স্টুয়ার্ট?' বিদ্রুপের স্বরে বললাম আমি। 'দু'পক্ষেই তুমি মার খেয়েছিলে তা আমাকে মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে?'

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল শিস।

'ডেভিড!' গর্জে উঠলো অ্যালান।

ওকে গ্রাহ্য না করে আমি বলে চললাম, 'শোনো, অ্যালান ব্রেক, তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি এরপর আমার রাজা বা আমার বন্ধু ক্যাম্পবেলদের সম্পর্কে কিছু বলার সময় ভদ্র ভাবে বলবে।'

'আমি একজন স্টুয়ার্ট—' শুরু করলো অ্যালান।

'জানি জানি, তুমি একজন স্টুয়ার্ট, আর তা নিয়ে বেশ অহঙ্কারও আছে তোমার। কিন্তু জেনে রাখো, আমাদের দক্ষিণে তোমার ঐ পদবিওয়ালা লোক বহু আছে, বলতে দ্বিধা নেই, তাদের চেয়ে খারাপ

লোক আমি খুব কমই দেখেছি।'

'তুমি আমাকে অপমান করছো?' ঠাণ্ডা হিসহিসে গলায় বললো অ্যালান।

'এতে যদি তোমার অপমান হয় আমি দুঃখিত। কিন্তু যা সত্যি তা আমি বলবোই।'

অনড় দাঁড়িয়ে আছে অ্যালান। যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না, এ ধরনের কথা বের হতে পারে আমার মুখ দিয়ে। বাতাসে উড়ছে ওর লম্বা কোটের পেছনটা। চোখ দুটো স্থির আমার চোখের ওপর।

'দুঃখিত.' অবশেষে বললো ও। 'এবার তোমাকে একটু শিক্ষা দিতেই হচ্ছে।'

'তৈরি আমি, অ্যালান।'

'তৈরি?'

'হ্যাঁ তৈরি। তোমার মতো ফালতু কথা আমি বলি না। যা বলি ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে তারপর বলি।' এক টানে তলোয়ার বের করলাম আমি। ক্লানির ওখান থেকে রওনা হওয়ার সময় ও দিয়েছিলো তলোয়ারটা। অ্যালানেরই শেখানো কৌশলে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালাম ওটা উঁচু করে।

একটু যেন ঘাবড়ে গেল অ্যালান। 'তুমি কি পাগল হলে, ডেভিড?' বললো ও। 'আমি তোমার সাথে লড়বো! তা কি করে হয়? এ তো ঠাণ্ডা মাথায় খুন!'

'সেটা তোমার ব্যাপার। আমাকে অপমান করছো, অপমানের শোধ নেয়ার চেষ্টা আমি করবো। বাঁচি মরি কিছু এসে যায় না।'

'হুঁ!' চুপ করে গেল অ্যালান। ধীরে ধীরে খাপ থেকে তলোয়ার বের করলো। লড়াইয়ের ভঙ্গিতে প্রস্তুত হলো। তারপরই তলো-

য়ারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো ও। বললো, 'না, না, ডেভিড,' একটু যেন ফুঁপিয়ে ওঠার মতো ওর কণ্ঠস্বর। 'আমি পারবো না, পারবো না, ডেভিড, আমি পারবো না তোমাকে খুন করতে।'

মুহূর্তে আমার রাগ যেকোথায় গেল আমি জানি না। প্রচণ্ড ক্লান্তি আর অনুতাপ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরলো আমাকে। মনে হলো পায়ের নিচে মাটি দু'ভাগ হয়ে গেলে ভেতরে প্রবেশ করতাম! উহ! এই অ্যালানকেই কি বিশ্রী অপমানজনক সব কথা বলেছি!

পা টলতে শুরু করেছে। তবু এখন একটাই মাত্র চিন্তা আমার মাথায়, কি করে অ্যালানকে একটু খুশি করবো। যে সব কথা বলেছি তাতে আমার মুখ দেখা উচিত নয় ওর। সুতরাং মাফ চাইলে যে লাভ হবে না বেশ বুঝতে পারছি।

'অ্যালান!' সমস্ত অহঙ্কার বিসর্জন দিয়ে অবশেষে আমি বললাম 'তুমি যদি সাহায্য না করো এখানেই মরবো আমি।'

চমকে উঠে বসলো ও। আমার দিকে তাকালো। আমি দেখলাম, ওর দু'চোখের কোনায় পানি চিক চিক করছে।

'সত্যিই বলছি, কান্নার মতো শোনালো আমার গলা, 'দয়া করে কোনো বাসায় নিয়ে চলো আমাকে। একটু শান্তিতে মরতে পারবো।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো অ্যালান। তারপর বললো, 'হাঁটতে পারবে?'

'না। সাহায্য ছাড়া কিছুতেই পারবো না। শেষ কয়েকটা ঘণ্টা যে কি ভাবে হেঁটেছি তা আমিই জানি। শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে মরে যাবো। অ্যালান, মরে গেলে আমাকে ক্ষমা করে

দিয়ো।'

'দূর দূর!' চিৎকার করলো অ্যালান। 'ওসব কথা রাখো তো। ডেভিড, তুমি জানো—' ফুঁপিয়ে উঠে থেমে গেল ও। উঠে দাঁড়ালো। দেখি তোমার হাতটা দাও তো আমার কাঁধের ওপর দিয়ে। হ্যাঁ, এবার আমার ওপর ভর দাও। অ্যাঁ, এই তো, চলো এবার।'

কয়েক পা এগোলাম আমরা এভাবে।

আবার ফুঁপিয়ে উঠলো অ্যালান। 'ডেভিড, সত্যিই খুব বাজে লোক আমি। না আছে কাণ্ডজ্ঞান না আছে মমতা। আমি ভুলে গিয়েছিলাম, আমার চেয়ে অনেক ছোট তুমি, এ সব এলাকায় হেঁটে অভ্যস্ত নও তা-ও খেয়াল ছিলো না। আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো, ডেভিড!'

'ওহ, অ্যালান, খামোকা কেন লজ্জা দিচ্ছো আমাকে!···উহ! কাছাকাছি কোনো বাড়ি ঘর নেই?'

'জানি না। তবে আমি খুঁজে বের করবো, ডেভিড। আর একটু কষ্ট কর। ঐ তো ওখানে একটা ঝরনা দেখছি। ওর আশেপাশে নিশ্চয়ই বাড়ি ঘর আছে।'

দু'পা এগোলাম আমরা নিঃশব্দে। তারপর আবার অ্যালান বললো, 'তার চেয়ে তোমাকে কাঁধে তুলে নিই আমি। উঠতে পারবে না?'

'কি করে তুমি আমাকে কাঁধে নেবে অ্যালান? আমি তোমার চেয়ে বারো ইঞ্চি লম্বা।'

'দূর, ওসব লম্বায় কিছু হবে না, দেখ কি করে নেই।' বলতে বলতে অবলীলাক্রমে আমাকে কাঁধে তুলে নিলো অ্যালান। এবার হু হু করে কেঁদে ফেললাম আমি।

'ওহ! অ্যালান, কেন আমার সাথে এতো ভালো ব্যবহার করছো? আমি তো এর যোগ্য নই!'

'জানি না,' বললো অ্যালান। 'হয়তো তোমাকে ভালোবাসি বলে।'

প্রথম যে বাড়িটা চোখে পড়লো সেটার কাছে নিয়ে গেল আমাকে অ্যালান। দরজায় ধাক্কা দিলো। এই এলাকায় খুব একটা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয় ব্যাপারটা। কারণ এখানকার লোকরা বেশ স্বেচ্ছাচারী। স্থানীয় কোনো শাসনকর্তা নেই। ফলে আইন শৃঙ্খলার বালাই-ও বলতে গেলে নেই।

আমাদের ভাগ্য ভালো বাড়িটার মালিক একজন ম্যাকলারেন। অ্যালানের নাম আগে থেকেই জানে সে। এবং শুনে শুনেই ওর জন্যে একটা শ্রদ্ধাবোধ গড়ে উঠেছে তার মনে। ফলে সে বেশ সমাদরের সাথেই গ্রহণ করলো আমাদের। বাড়ির দরজায় পৌছানোর কয়েক মিনিটের মাথায় উষ্ণ বিছানায় নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে। ডাক্তার ডেকে আনা হলো। গম্ভীর মুখে আমাকে দেখলেন ডাক্তার।

ডাক্তারের ডাক্তারীর গুণে নাকি আমি একটু অস্বাভাবিক রকম শক্ত বলে জানি না, এক সপ্তার বেশি বিছানায় শুয়ে থাকতে হলো না আমাকে। এবং এক মাস পর সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় পথে নামতে পারলাম আমি।

এই পুরো মাসটা দিনের বেলায় কাছের ছোট্ট একটা বনে লুকিয়ে থেকেছে অ্যালান। রাতে ম্যাকলারেনের বাসায় ফিরেছে আমাকে দেখার জন্যে। এবং তারপর থেকে ভোর পর্যন্ত আমার কাছে কাছে থেকেছে। অনেক বলেও বিছানার পাশ থেকে সরাতে পারিনি ওকে। লাল-কোর্তাদের চেহারা দু'চারদিন দেখেছি জানালা দিয়ে। একবারও

ঘরে ঢোকার চেষ্টা করেনি ওরা। সম্ভবত টেরই পায়নি, আমি আছি ম্যাকলারেনের ঘরে। ম্যাকলারেন অত্যন্ত সতর্কতার সাথে গোপন রেখেছে আমাদের উপস্থিতি।

একমাস পর, আগস্টের একুশ তারিখ রাতে আবার রওনা হলাম আমরা। ঠিক করেছি, আগে কুইনস ফেরিতে যাবো। ওখানে মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলরের সাথে দেখা করে আমার উত্তরাধিকার সম্পর্কে নিশ্চিত হবো। যদি আমিই শ'বাড়ির আইনসম্মত মালিক হই তাহলে তো আর চিন্তা নেই। যদি না হই তাহলে একটা কিছু উপায় করবো অ্যালানকে ফ্রান্সে পৌঁছে দেয়ার। কি উপায় এখনো জানি না। সময় মতো কিছু একটা ভেবে বের করবো।

প্রথম রাতটা হেঁটে ভোরের আগে স্ট্র্যাথায়ার-এ পৌঁছুলাম আমরা। অ্যালানের বাবার বন্ধু জনৈক ম্যাকলারেনের বাড়িতে কাটালাম বাইশ তারিখটা। রাত নামার সাথে সাথে আবার রওনা হলাম। সারা রাত হেঁটে ভোরে পৌঁছুলাম উয়াম ভ্যার-এর পাহাড়ী এলাকায়। সেখানে এক ঝোপের ভেতর আরামে কাটিয়ে দিলাম দিনটা। সন্ধ্যায় আবার হাঁটা।

আগস্টের চব্বিশ তারিখ ভোরে পৌঁছুলাম কুইনস ফেরির ঠিক বাইরে ছোট্ট এক বনে। তখনো সূর্য ওঠেনি।

ছাব্বিশ

ঠিক হলো সন্ধ্যা পর্যন্ত বনে লুকিয়ে থাকবে অ্যালান। সূর্য ডোবার পর নিউহলস-এর রাস্তার পাশে চলে আসবে। আমি গিয়ে শিস না বাজানো পর্যন্ত ওখানেই শুয়ে থাকবে। সংকেত হিশেবে আমি প্রস্তাব করলাম আমার অত্যন্ত প্রিয় একটা গানের সুর। আপত্তি করলো অ্যালান। ও বললো গানটা বহুল প্রচলিত, সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে কোনো কৃষক হয়তো শিস দিয়ে উঠবে ঐ সুরে, তখন বিপদে পড়ে যাবে ও। অবশেষে অন্য একটা সুর ঠিক করে বিদায় নিলাম আমি। সূর্য উঠতে উঠতে কুইনসফেরির প্রশস্ত সড়কে পৌঁছে গেলাম।

সাজানো গোছানো শহর কুইনসফেরি। বাড়িগুলো মজবুত পাথরে তৈরি। ছিমছাম সুন্দর। এত সুন্দর যে, গায়ের জীর্ণ পোশাকের জন্যে লজ্জা হতে লাগলো আমার। কেবলই মনে হচ্ছে এমন সুন্দর শহরে আমার মতো ছেঁড়া, নোংরা পোশাক পরা মানুষ মানায় না।

বেলা একটু একটু করে বাড়ছে। সেই সাথে বাড়ছে রাস্তায় লোক চলাচল। আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছে বেশিরভাগ পথচারী। প্রথমে বুঝতে পারলাম না কারণটা। একটু পরেই দিনের আলোর

মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। আমার পোশাক যে শুধু নোংরা, ছেঁড়া-খোঁড়া তা নয়, দীর্ঘ পথশ্রমে চেহারাও মলিন হয়ে আছে। ওরা সবাই ভিক্ষুক ভাবছে আমাকে। ভাবুক, তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু আমার সমস্যার সমাধান করি কি করে? মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলরের বাড়ি আমি চিনি না। কাউকে জিজ্ঞেস করলেই হয়তো চেনা যায়, কিন্তু পথচারীদের চাউনি দেখে জিজ্ঞেস করার সাহস হারিয়ে ফেলেছি। মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর কুইনসফেরির সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত, নামী লোকগুলোর একজন। ভিক্ষুকের মতো চেহারার এক ছেলে যদি তাঁর বাড়ির খোঁজ করে, তাকে পাগল ভাববে না তারা?

ভেবে ভেবেও কোনো কূল কিনারা পেলাম না। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে সুন্দর একটা বাড়ির দোরগোড়ায় বসলাম বিশ্রাম নেয়ার জন্যে। আমি বসার পর কয়েক মিনিটও পেরোয়নি, খুলে গেল দরজা। দামী পরচুলা লাগানো প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ তাঁর চেহারায়, মুখে সদয় ভঙ্গি। দেখে একটু সাহস পেলাম আমি। জিজ্ঞেস করলাম, 'মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলরের বাড়িটা কোথায় বলতে পারবেন, স্যার?'

'কেন!' বললেন তিনি, 'এটাই তো তাঁর বাড়ি। আর আমিই র‍্যাঙ্কেইলর।'

'আপনিই মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর! আমি, স্যার, একটু কথা বলতে চাই আপনার সঙ্গে।'

'আমার সাথে কথা বলবে। কিন্তু কে তুমি?'

'আমার নাম ডেভিড ব্যালফোর।'

'ডেভিড ব্যালফোর!' অবাক গলায় উচ্চারণ করলেন মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর। চশমার পুরু কাচের ভেতর দিয়ে তাকালেন তীক্ষ্ণ

দৃষ্টিতে। 'কোথা থেকে আসছো তুমি, ডেভিড ব্যালফোর ?'

'ওহ্, অনেক জায়গা থেকে, স্যার। সে এক লম্বা কাহিনী, রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলবো···?'

'না, ভেতরে এসো।'

আমাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলেন মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর। ছোট্ট একটা ঘরে ঢুকলেন। ঘরটার চারদিকে ছাদ সমান উঁচু আলমারিতে থরে থরে সাজানো বই। ভদ্রলোকের পড়ার ঘর এটা। আমাকে একটা চেয়ারে বসতে ইংগিত করে নিজে আরেকটা চেয়ারে বসলেন।

'হ্যাঁ, এবার ঝটপট বলে ফেল যা বলার। নষ্ট করার মতো অঢেল সময় আমার নেই।'

'স্যার,' আমি বললাম, 'আমার বিশ্বাস, শ বাড়ির আইনসম্মত মালিক আমি।'

আর কিছু বলতে পারলাম না। অনুভব করছি, রক্ত উঠে আসছে আমার মুখে। কান গরম হয়ে উঠছে।

একটা দেরাজ থেকে বাঁধানো একটা খাতা বের করলেন মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর। 'তারপর ?'

কিন্তু কুলুপ এঁটে গেছে যেন আমার মুখে। চেষ্টা করেও আর একটা শব্দ উচ্চারণ করতে পারলাম না।

'বলো বলো, মিস্টার ব্যালফোর। জন্ম কোথায় তোমার ?'

'এসেনডিন-এ, স্যার। ১২ মার্চ ১৭৩৩।'

খাতাটা খুলে একটা পৃষ্ঠা ওল্টালেন মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন পৃষ্ঠার দিকে। তারপর আবার আমার মুখের ওপর স্থির হলো তাঁর দৃষ্টি।

'হ্যাঁ, বলে যাও। তোমার বাবা মা-র নাম কি ?'

'আমার বাবার নাম আলেকজাণ্ডার ব্যালফোর, এসেনডিনের স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। আর মা-র নাম গ্রেস পিটারো।'

'পরিচয় প্রমাণ করার মতো কোনো কাগজপত্র আছে তোমার কাছে?'

'না, স্যার, আমার সাথে নেই। এসেনডিনে রাজ-প্রতিনিধি মিস্টার ক্যাম্পবেলের কাছে রয়েছে ওগুলো। উনি আমার সম্পর্কে জানেন ভালো করে। আমার চাচাও আশা করি অস্বীকার করবে না, আমাকে চেনে।'

'এবেনের ব্যালফোর-এর কথা বলছো?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'ওর সাথে দেখা হয়েছে তোমার?'

'হ্যাঁ, কয়েকদিন থেকেছি-ও ওর বাড়িতে।'

'হোসিসন নামের কোনো লোককে চেনো?'

'নিশ্চয়ই, স্যার। আমার চাচার প্ররোচনায় ও-ই তো চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলো আমাকে। আমার চাচা সেজন্যে টাকাও দিয়েছিলো ওকে। দাস হিসেবে বিক্রি করার জন্যে আমাকে আমেরিকায় নিয়ে যাচ্ছিলো হোসিসন। পথে জাহাজডুবি হওয়ায় কোনো মতে বেঁচে গেছি এযাত্রা।'

'কোথায় জাহাজডুবি হয়েছিলো?'

'মুল-এর উপকূলে, স্যার। অনেক কষ্টে ছোট্ট একটা দ্বীপে উঠতে পেরেছিলাম।'

'কবে ঘটেছিলো এ ঘটনা?'

'জুনের সাতাশ তারিখে।'

বাঁধানো খাতাটার ওপর আরেকবার চোখ বুলালেন মিস্টার

র‍্যাঙ্কেইলর। মুখ দেখে মনে হলো আমার জবাবে সন্তুষ্ট হয়েছেন তিনি।

'জাহাজটা ডুবেছিলো জুনের সাতাশ তারিখে,' চিন্তিত গলায় বললেন মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর, 'আর আজ হচ্ছে আগস্টের চব্বিশ। প্রায় দুই মাস। এই সময়টায় কি করেছো তুমি?'

'বলবো, স্যার, সব বলবো। কিন্তু আগে আমাকে জানতে হবে, যাঁর সাথে কথা বলছি তিনি বন্ধু তো?'

'আমাকে বিশ্বাস করতে পারো, ডেভিড,' স্নেহের সুরে বললেন আইনজীবী। 'তোমার বন্ধু হতে রাজি আমি। রাজ-প্রতিনিধি মিস্টার ক্যাম্পবেলের কাছে তোমার কথা শুনেছি। তোমার সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা তাঁর। তোমার খোঁজ নেয়ার জন্যে গত দু'মাসে বেশ কয়েক বার উনি আমার কাছে এসেছেন। তুমি কোনো চিঠিপত্র লেখোনি বলে দুশ্চিন্তায় আছেন ভদ্রলোক। তোমার চাচা এবেনের-ও এসেছিলো আমার কাছে। ও বলছিলো, তোমাকে নাকি টাকা-পয়সা দিয়ে বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে লেখাপড়া করার জন্যে। অবশ্য ওর একটা কথাও আমি বিশ্বাস করিনি। তারপর এলো ক্যাপ্টেন হোসিসন। ওর কাছে জানতে পারলাম, তুমি নাকি মুলের কাছাকাছি কোথায় সাগরে ডুবে মারা গেছ। তোমার চাচা যে আমার কাছে এসে একরাশ মিথ্যে কথা বলে গেছে তখন আর তাতে কোনো সন্দেহ রইলো না আমার।'

আমার মনে হচ্ছে মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলরকে বিশ্বাস করা যায়। তাকে বললাম সেকথা। শেষে যোগ করলাম, 'কিন্তু আমার কাহিনী যদি শোনাই, আমার অত্যন্ত প্রিয় এক বন্ধুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। আপনি যদি প্রতিশ্রুতি দেন, ও নিরাপদে থাকবে তাহলে

বলতে পারি।'

'কে সে?'

'অ্যালান ব্রেক, স্যার।'

শোনার সাথে সাথে ভুরু কুঁচকে উঠলো মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলরের। সন্দেহ নেই অ্যালান ব্রেক আর সতর বছর বয়েসী এক ছোকরাকে ধরিয়ে দেয়ার বিজ্ঞপ্তিটা তাঁর চোখে পড়েছে।

'বেশ, আমি কথা দিচ্ছি ওর কোনো ক্ষতি হবে না,' বললেন আইনজীবী। 'তবে তুমি তোমার কাহিনী বলার সময় অন্য কোনো নামে পরিচয় দেবে ওর। এই যেমন ধরো, মিস্টার টমসন, রাজি? তাহলে আমি, আঁ, হলফ করে বলতে পারবো কোনো কিছু শুনিনি···শুনিনি ওর···ওর সম্পর্কে। বুঝতেই পারছো আমি একজন আইনজীবী। আমার পক্ষে তত সহজ নয় অমন একটা কথা গোপন রাখা।'

মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলরকে শোনালাম আমার কাহিনী; আমার বাড়ি ছাড়া থেকে শুরু করে আজ সকালে কুইনস ফেরিতে পৌছানো পর্যন্ত। চোখ বন্ধ করে শুনলেন উনি। একবার মনে হলো ভদ্রলোক বোধহয় ঘুমিয়ে গেছেন। কিন্তু না, আমার বলা শেষ হতেই চোখ খুললেন মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর।

'ওহ, রীতিমতো মহাকাব্য শোনালে দেখি!' অবশেষে বললেন তিনি। 'মাত্র কয়েক মাসে প্রচুর দুঃসাহসিক কাজ করতে হয়েছে তোমাকে। ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েও মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করেছো। কিন্তু···কিন্তু তোমার বন্ধু, মানে ঐ মিস্টার অ্যাল···টমসন লোকটা একটু বেশি বুনো প্রকৃতির। যাকগে···আঁ, আমার মনে হয় তোমার দুঃখের দিন প্রায় শেষ।' সস্নেহে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন তিনি। তারপর বললেন, 'এবার একটু সাফ-সুতরো হওয়া দরকার

তোমার। চলো, স্নানের ঘর দেখিয়ে দি।' পড়ার ঘর থেকে বেরিয়েই তিনি কারো উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই। দুপুরে টেবিলে একটা বাসন বেশি দিও, মিস্টার ব্যালফোর খাবে আমাদের সাথে।'

আমাকে স্নানের ঘর দেখিয়ে দিয়ে নিজের হাতে তাঁর ছেলের কিছু কাপড় এনে দিলেন মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর।

'স্নান করে, পোশাক পাল্টে আমার ঘরে এসো,' বললেন তিনি। 'তোমার বাবার গল্প শোনাবো।'

সাতাশ

ভালো করে গা হাত পা রগড়ে স্নান করলাম। আমার জীর্ণ পোশাক পাল্টে মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলরের ছেলের পরিষ্কার পোশাক পরলাম। চুল আঁচড়ে বেরিয়ে এলাম স্নানঘর থেকে। মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলরের পড়ার ঘরে যখন পৌঁছুলাম তখন মনে হলো আমি যেন সেই ডেভিড ব্যালফোর নই, সম্পূর্ণ অন্য মানুষ।

'বোসো, মিস্টার ডেভিড,' বললেন আইনজীবী। 'এতক্ষণে তোমাকে একটু তোমার মতো দেখাচ্ছে।' একটু থেমে আবার বললেন, 'নিশ্চয়ই তোমার বাবা এবং চাচা সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠেছো?'

'সত্যি কথা বলতে কি, কৌতূহলে মরে যাচ্ছি আমি।'

'তাহলে শোনো, তোমার চাচা সব সময়ই এমন বুড়ো ছিলো না। শুনলে হয়তো আশ্চর্য হবে, আগে এত কুৎসিতও ছিলো না ও। চমৎকার সুপুরুষ ছিলো এবেনের। সবাই পছন্দ করতো ওকে। ঘোড়ায় চেপে যখন রাস্তা দিয়ে যেতো, মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতো।'

'আমার চাচা এবেনেরকে!' বিস্ময়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম। 'স্বপ্নের মতো লাগছে শুনতে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ. এটাই হলো যৌবন আর বৃদ্ধ বয়সের পার্থক্য। যা হোক ও ছিলো ছোট, তোমার বাবা বড়। ছোট বলে পরিবারের সবাই ওকে খুব আদর করতো। সেটাই কাল হলো। বেশি আদর পেয়ে মাথায় উঠে গেল ছোকরা। ভীষণ হিংসুটে আর বখাটে হয়ে উঠলো।'

'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না এ কথা!'

'তুমি বিশ্বাস না করতে পারলেও যা বলছি সব সত্যি। যৌবনের শুরুতে তোমার বাবা আর এবেনের একই মেয়ের প্রেমে পড়ে। মেয়েটা তোমার বাবাকেই বেছে নেয়। এতে ক্ষেপে যায় তোমার চাচা. ভীষণ ভাবে ক্ষেপে যায়। ওহ, তারপরসে কি ঝামেলা, গণ্ডগোল দু'ভাইয়ের ভেতর! যা হোক, শেষ পর্যন্ত ফয়সালা হলো, তোমার বাবা শ বাড়ির স্বত্ব ছেড়ে দিলো, বিনিময়ে পেলো মেয়েটাকে। আর তোমার চাচা সম্পত্তি পেয়ে ভুলে গেল মেয়েটার কথা।

'যে যা-ই বলুক, আমি বলবো বোকার মতো কাজ করেছিলো তোমার বাবা। সম্পত্তি ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে কোনো আইনজ্ঞের পরামর্শ নেয়নি ও। ফল কি হয়েছে? মেয়েটাকে বিয়ে করে এসেনডিনের মতো অখ্যাত এক জায়গায় গিয়ে জীবন কাটাতে হয়েছে। তুমি জানো, কি দারিদ্র্যের ভেতর ওকে থাকতে হয়েছে সেখানে। আর এদিকে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে শ-দের অধীনস্থ চাষীদের। ওদের সাথে জঘন্য নিষ্ঠুর আচরণ করেছে তোমার চাচা। বহু প্রজাকে ভিটে মাটি ছাড়া করেছে নির্দয় ভাবে।'

জ্যানেট ক্লাউস্টনের অভিশাপের কথা মনে পড়ে গেল আমার।

'যত দিন যেতে লাগলো, ততই বেপরোয়া হয়ে উঠতে লাগলো এবেনের। অন্যান্য দিক থেকেও খারাপ হয়ে উঠলো ওর অবস্থা। নানা কেচ্ছা রটতে শুরু করলো ওর নামে। আলেকজাণ্ডার, মানে তোমার

বাবা কোথায় গেছে কেউ জানে না, সুতরাং ওরা রটিয়ে দিলো এবেনের খুন করেছে ওকে। ফল হলো, সবাই এড়িয়ে চলতে লাগলো তোমার চাচাকে। একঘরে হয়ে পড়লো বেচারা। টাকা ছাড়া আর কিছুই রইলো না ওর। ফলে টাকাই হয়ে উঠলো ওর ধ্যান, জ্ঞান, প্রেম। আরো বেশি টাকা কামানোর জন্যে নিত্য নতুন ফন্দি বের করতে লাগলো এবেনের। তাতে প্রজাদের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে উঠলো। বললে বিশ্বাস করবে, টাকার জন্যে ও করতে পারে না হেন কাজ নেই?

চুপচাপ শুনলাম আমি কথাগুলো। অবশেষে বললাম, 'আমার বাবা শ বাড়ির স্বত্ব ত্যাগ করেছিলেন, তার মানে কি এই, ও বাড়ির ওপর আমারও কোনো অধিকার নেই?'

'শ দের বাড়ি এবং সমস্ত ভুসম্পত্তির মালিক তুমি, ডেভিড।' শিরশিরে একটা অনুভূতি নেমে এলো আমার শরীর বেয়ে। আমি তাহলে সত্যিই শ বাড়ির মালিক! 'আইন অনুযায়ী তুমিই হচ্ছো একমাত্র উত্তরাধিকারী,' বলে চললেন মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর। 'কিন্তু সম্পত্তিটায় দখল রয়েছে তোমার চাচার। ও সর্বশক্তিতে লড়বে ওটা রক্ষা করার জন্যে। তুমি আইনের আশ্রয় নিতে পারো, কিন্তু সেজন্যে প্রচুর টাকা লাগবে। তোমার চাচা তোমাকে হোসিসনের হাতে তুলে দেয়ার পর কি কি করেছো জানতে চাইবেন বিচারক, তখন তোমার সেই বন্ধু মিস্টার টমসনের কথা প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে ভয়ানক ঝামেলায় জড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তোমার। তাছাড়া তোমার চাচা তোমাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে হোসিসনকে টাকা দিয়েছে এর কোনো প্রমাণ আছে? কোনো সাক্ষী? শুধু মাত্র তোমার কথায় তো মন গলবে না বিচারকের।'

এক মুহূর্ত ভাবলাম আমি। তারপর বললাম, 'কভেন্যান্ট-এর কোনো নাবিক হয়তো কথা বলবে আমার পক্ষে।'

'হয়তো। হয়তো মিস্টার টমসন সম্পর্কেও বলবে সে। তখন? কেঁচো খুড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়বে।'

চোখ বুজলেন মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর। চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবলেন কি যেন।

'আমার পরামর্শ হলো,' অবশেষে নীরবতা ভাঙলেন তিনি, 'তোমার চাচা বুড়ো হয়েছে, ওকে থাকতে দাও বাড়িতে! তবে সম্পত্তি থেকে যা আয় হয় তার অর্ধেকটা যেন তোমাকে দেয় সে ব্যাপারে বাধ্য করতে হবে ওকে। আমার মতে এটাই আপাতত সবচেয়ে ভালো সমাধান।'

'হুঁ,' বললাম আমি, 'কিন্তু আয়ের অর্ধেকটা দিতে কি ভাবে বাধ্য করবেন ওকে?'

'তোমাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে হোসিসনের সঙ্গে ও যে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছিলো তা প্রমাণ করতে পারলেই হবে। তোমার বন্ধুর নাম প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয় আছে, সেজন্যে আমরা আদালতে যেতে পারবো না। প্রমাণটা করতে হবে আদালতের বাইরে।'

'কিন্তু কি ভাবে?'

'আমিও তাই ভাবছি, কি ভাবে?'

দু'জনেই নিঃশব্দে ভাবতে লাগলাম। অবশেষে একটা বুদ্ধি এলো আমার মাথায়।

'চাচাকে ফাঁদে ফেলতে হবে,' বললাম আমি। 'ওকে দিয়ে বলাতে হবে, ও আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে টাকা দিয়েছিলো হোসিসনকে। এবং কথাটা বলাতে হবে একজন সাক্ষীর সামনে।'

'ভালো কথা,' বললেন মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর, 'কিন্তু কি ভাবে এমন একটা কথা স্বীকার করাবে তোমার চাচাকে দিয়ে ?'

'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে শুনুন !'

আমি বলে গেলাম আমার পরিকল্পনাটা।

মনোযোগ দিয়ে শুনলেন মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর। সবশেষে মাথা ঝাঁকালেন। বুদ্ধিটা পছন্দ হয়েছে ওঁর। তবু বললেন, 'তোমার পরিকল্পনার অর্থ হলো মিস্টার টমসনের সাথে সাক্ষাৎ হবে আমার। তাতে বিপদ আছে, ডেভিড। ওর জন্যে, আমার জন্যেও। দাঁড়াও, ভালো করে আরেকবার ভেবে দেখি।'

কিছুক্ষণ ভাবলেন তিনি। তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'জানো, ডেভিড, চশমা ছাড়া প্রায় কিছুই দেখতে পাই না আমি। মিস্টার টমসনের সাথে যখন দেখা করতে যাবো তখন যদি চশমা ছাড়া যাই তাহলে কেমন হয় ? ওকে দেখতে পাবো না আমি। এবং পরে যদি কখনো জেরার মুখে পড়তে হয়, হলফ করে বলতে পারবো লোক-টাকে আমি দেখিনি। হ্যাঁ, চশমা ছাড়াই যাবো মিস্টার টমসনের সাথে দেখা করতে। ও-ও নিরাপদে থাকবে, আমিও।'

'তাহলে আমার পরিকল্পনা আপনার পছন্দ হয়েছে ?'

'হ্যাঁ।'

'এ অনুযায়ী কাজ করবেন আপনি ?'

'আজ সন্ধ্যায়-ই।'

সন্ধ্যায় রওনা হলাম আমি আর মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর। প্রথমে যাবো অ্যালান যেখানে লুকিয়ে থাকবে সেখানে। তারপর শ বাড়িতে। মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর তাঁর কেরানী টোরেন্সকে সঙ্গে নিয়েছেন। ভারি

একটা ঝুড়ি হাতে আমাদের পেছন পেছন আসছে সে।

নিউহলস-এর রাস্তার পাশে যেখানে অ্যালানের থাকার কথা সেখানে পৌঁছে শিস বাজালাম আমি। কয়েক সেকেণ্ড পরেই প্রায় অন্ধকার মাঠের ভেতর একটা ছায়ামূর্তিকে দেখলাম। একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর আর টোরেন্সকে রেখে আমিও এগিয়ে গেলাম ওর দিকে।

সারাদিন প্রায় অনাহারে ছিলো, তবু আমাকে দেখেই উজ্জ্বল হাসিতে ভরে উঠলো অ্যালানের মুখ। আমার গায়ে নতুন পোশাক দেখে চোখ বড় বড় হয়ে গেল ওর। যখন আমি আমার ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনার কথা এবং তাতে ওকে কি ভূমিকা নিতে হবে বললাম। একলাফে অন্য মানুষ হয়ে গেল অ্যালান। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলো ও আমাদের সাহায্য করতে।

মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলরের দিকে তাকিয়ে চেঁচালাম আমি। হাত নাড়লাম। টোরেন্সকে রাস্তার উপর দাঁড় করিয়ে রেখে এগিয়ে এলেন তিনি। আমার বন্ধু মিস্টার টমসনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম ওঁর।

'আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম, মিস্টার টমসন,' বললেন তিনি। 'কিন্তু আমি আমার চশমাটা ভুলে ফেলে এসেছি। আমি আবার চশমা ছাড়া কিছুই দেখতে পাই না। কাল যদি আবার আপনাকে দেখে না চিনতে পারি, অবাক হবেন না যেন।'

অ্যালান খুশি হবে ভেবে কথাটা বললেন মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর। কিন্তু ঘটলো উল্টোটা।

'কিছু এসে যায় না, স্যার,' বললো অ্যালান। 'মিস্টার ব্যাল-

ফোরকে সাহায্য করার জন্যে আমরা এক জায়গায় হয়েছি, ওটুকু হলেই চলবে। কাল আপনি আমাকে চিনলেন কি না চিনলেন তাতে কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না।'

'বেশ বেশ, মিস্টার টমসন।' অ্যালানের ক্ষোভটাকে পাত্তাই দিলেন না আইনজীবী। 'এখন দয়া করে আপনার হাতটা একটু দেবেন? আমি ধরবো। চোখে কিছুই দেখছি না, এই বুড়ো বয়েসে হোঁচট খেয়ে দাঁত ভাঙতে চাই না।'

যখন আমরা শ বাড়িতে পৌঁছুলাম তখন পুরোপুরি রাত হয়ে গেছে। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। তার ভেতর ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে বিরাট বাড়িটা। একটা জানালায়ও বাতি দেখা যাচ্ছে না। বাদুড়, চামচিকা আর পেঁচাদেরই যেন রাজত্ব ওটা।

পূর্ব-পরিকল্পনা মতো কাজ করলাম আমরা। আমি, মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর আর তাঁর কেরানী দাঁড়িয়ে গেলাম বাড়ির এক কোনায়। দৃঢ় পায়ে, বুক টান করে এগিয়ে গেল অ্যালান সদর দরজার দিকে। একটু পরে শুনতে পেলাম দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে ও।

আঠাশ

ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়ে চলেছে অ্যালান দরজায়। কোনো সাড়াশব্দ নেই ভেতর থেকে। দড়াম দড়াম করে কয়েকটা লাথি হাঁকালো ও এরপর। হঠাৎ প্রায় নিঃশব্দে খুলে গেল ওপরের একটা জানালা। আমি জানি, চাচা এখন উঁকি দিচ্ছে জানালা দিয়ে। অন্ধকারে আবছাভাবে অ্যালানকে দেখতে পাবে ও, কিন্তু আমাদের পাবে না।

'কে?' এবেনের চাচার গলা শুনতে পেলাম। 'এত রাতে কোনো ভদ্রলোকের তো বাইরে থাকার কথা নয়। কি চাও তুমি? দেখ, আমার হাতে কিন্তু বন্দুক আছে। সাবধান!'

'আপনি কি মিস্টার ব্যালফোর?' কয়েক পা পিছিয়ে এসে উপরের দিকে তাকালো অ্যালান। 'বন্দুক সাবধানে ধরুন, জনাব, গুলি বেরিয়ে যেতে পারে।' কৌতুকের সুর ওর গলায়।

'কে তুমি, কি চাও আমার কাছে?'

'আমার নাম না জানলেও চলবে আপনার। আমি আমার ব্যাপারে আসিনি।'

'তাহলে কার ব্যাপারে এসেছো?'

'ডেভিডের।'

'কি! কি? আর্তনাদের মতো শোনালো চাচার গলা।

'পুরো নাম না বললে চিনবেন না?'

'না না, দরকার নেই।' সন্ত্রস্ত এবেনের চাচার কণ্ঠস্বর। 'আমি দরজা খুলছি, তুমি ভেতরে এসো।'

'উঁহু,' বললো অ্যালান, 'ভেতরে নয়, আমি বাইরেই থাকছি, আপনিও বাইরে আসুন। বাইরেই কথা হবে আপনার সাথে। ভয় পাবেন না, আমি ভদ্রলোকের ছেলে, আপনার কোনো ক্ষতি করবো না।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো এবেনের চাচা। অবশেষে বললো, 'ঠিক আছে। আমি আসছি।'

জানালা বন্ধ হওয়ার শব্দ। তারপর আবার সব চুপচাপ। বেশ কিছুক্ষণ পর প্রথমে শিকল তারপর বল্টু টানার আওয়াজ শোনা গেল। আবার নিস্তব্ধ চারদিক। মরচে ধরা কব্জার ক্যাঁচকুঁচটা পর্যন্ত শুনতে পেলাম স্পষ্ট। দরজা খুলে গেল। আরো দু'পা পিছিয়ে এলো অ্যালান। দরজার মুখে বসে পড়লো চাচা। তার হাতে এখনো ধরা আছে বন্দুকটা।

'দেখেছো, আমার কাছে বন্দুক আছে,' বললো এবেনের চাচা। 'এক পা-ও কাছে আসার চেষ্টা করবে তো গুলি খাবে।'

'অতিথিকে আহ্বান করার চমৎকার রীতি যাহোক!'

'কেন এসেছো তাই বলো।'

'আপনি বুদ্ধিমান মানুষ। আমার চেহারা, পোশাক-আশাক দেখে নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন। আমি এ এলাকার লোক নই। আমার বাড়ি উত্তরে, মুল-এর কাছে। অল্প কিছু দিন আগে একটা জাহাজ বিধ্বস্ত হয়েছে ওখানে। জাহাজটার নাম কভেন্যান্ট। যে দিন ওটা ডুবে যায় তার পরদিন আমার কয়েক দেশোয়ালি ভাই একটা

ছেলেকে উদ্ধার করেছে সাগরতীর থেকে। ওরা ওকে একটা প্রাচীন দুর্গে নিয়ে যায়। পরে জানতে পেরেছে ছেলেটা নাকি আপনার ভাইপো।

'বলতে সংকোচ হচ্ছে, আমার ভাইরা একটু বন্য প্রকৃতির। আইনের প্রতি খুব একটা শ্রদ্ধা নেই। ওরা ছেলেটাকে আটকে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আপনি যদি কিছু টাকা দেন তাহলে অবশ্য ছেড়ে দেবে। আর যদি টাকা না দেন, ওরা আমাকে জানিয়ে দিয়েছে, ভাস্তের মুখ আর কখনো দেখতে হবে না আপনাকে।'

'চাইও না দেখতে। আপদ ঘাড় থেকে নেমেছে তাতেই আমি খুশি। তুমি এক পয়সাও পাবে না আমার কাছ থেকে। তোমার ভাইদের বলে দিও ছোকরাকে নিয়ে যা ইচ্ছে করতে পারে। এবার কেটে পড়ো তুমি।'

কেটে পড়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না অ্যালানের ভেতর। 'কি বলছেন, স্যার! আপনার আপন ভাইয়ের ছেলে! রক্তের বন্ধন এত সহজে ছেঁড়া যায়? লোকে কি বলবে?'

'লোকে জানবে কোত্থেকে? আমি কাউকে বলবো না। তুমি বা তোমার ভাইরাও বলতে পারবে না।'

'সেক্ষেত্রে ডেভিড বলবে সবাইকে।'

'কি করে?' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো চাচার গলা।

'সহজ। টাকা না পেলে আমার ভাইরা ছেড়ে দেবে আপনার ভাইপোকে।'

'সেটাও আমি···আমি চাই না ···।'

'বেশ, তাহলে বলুন আমরা কি করবো? ছেলেটাকে চান না আপনি, কারণ? নিশ্চয়ই ও এমন কিছু জানে যা প্রকাশ পেলে আপ-

নার ক্ষতি হবে। ভালো কথা, আমার ভাইরা ওকে আটকে রাখবে, সেজন্যে কত দেবেন বলুন ?'

কোনো জবাব দিলো না আমার চাচা।

'তাড়াতাড়ি বলুন, স্যার! আমি আপনার চাকর নই যে যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখবেন। বললে বলুন না হলে তলোয়ার বের করলাম!'

'দাঁড়াও দাঁড়াও, একটু ধৈর্য ধরো,' কাঁপা কাঁপা গলায় বললো চাচা। 'আমাকে একটু ভাবার সময় দাও। একটু ভাবার সময় দাও। কেন আমাকে জ্বালাতে এসেছো ? দূরে থাকো আমার কাছ থেকে। তলোয়ারের ভয় দেখাচ্ছো ? আমার কাছে বন্দুক আছে ভুলে গেছ ?' শাসাচ্ছে কিন্তু ভয়ে কাঁপছে চাচার গলা।

হো হো করে হেসে উঠলো অ্যালান। 'আমার তলোয়ার আপনার বন্দুকের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত চলে, তা জানেন ? এবার বলুন, আমার সময় আর নষ্ট করবেন না। ছেলেটাকে আমরা মেরে ফেলবো, না বাঁচিয়ে রাখবো ?'

'উহ্। খুন খারাবির কথা বন্ধ করো তো!'

'মেরে ফেলবো না বাঁচিয়ে রাখবো ?' আবার জিজ্ঞেস করলো অ্যালান।

'বাঁচিয়ে—বাঁচিয়ে রাখো।'

'তাতে খরচ বেশি পড়বে।'

'বেশি পড়বে। কত!'

'কত ?' চিন্তিত স্বরে প্রতিধ্বনি করলো অ্যালান। 'একটু ভাবতে দিন। আঁ···হোসিসনকে কত দিয়েছিলেন ?'

'হোসিসনকে!' চিৎকার করে উঠলো চাচা। 'কেন!'

'কেন আবার, ছেলেটাকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে!'

'মিথ্যে কথা! জঘন্য মিথ্যে কথা। হোসিসন কখনো চুরি করেনি ওকে। আমি ওকে কখনো টাকাও দেইনি। কে বলেছে তোমাকে আমি দিয়েছি?'

'হোসিসন নিজে।'

'হোসিসন তোমাকে বলেছে!' আর্তনাদের মতো শোনালো চাচার গলা।

'নিশ্চয়ই, আমরা পুরনো বন্ধু, জানেন না? ওর ব্যবসায়ে আমারও কিছুটা অংশীদারী আছে। আপনি যতটুকু চেনেন আমি তার চেয়ে অনেক ভালো চিনি ওকে। গর্দভের মতো আপনি ওকে বিশ্বাস করেছিলেন। যাকগে, এখন বলুন কত দিয়েছিলেন ওকে?'

'বিশ পাউণ্ড,' আমতা আমতা করে বললো চাচা। 'ছেলেটাকে আমেরিকায় বিক্রি করতে পারলে আরো বিশ পাউণ্ড পেতো। অবশ্যই টাকাটা আমার পকেট থেকে যেতো না···।'

ঠিক এই সময় মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর, টোরেন্স আর আমি বেরিয়ে এলাম দালানের কোনা থেকে। প্রতিটা কথা শুনেছি আমরা।

মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলরই কথা বললেন প্রথমে।

'ধন্যবাদ, মিস্টার টমসন। যেটুকু শুনেছি তাতেই চলবে।' তারপর হঠাৎ যেন চোখ পড়লো এবেনের চাচার ওপর। 'ও, মিস্টার ব্যালফোর, আপনি! কেমন আছেন?'

'কেমন আছো, এবেনের চাচা?' এবার আমি।

'রাতটা সুন্দর, তাই না, মিস্টার ব্যালফোর?' যোগ করলো টোরেন্স।

উনত্রিশ

বজ্রাঘাত হয়েছে যেন এবেনের চাচার মাথায়। যেখানে ছিলো সেখানেই বসে রইলো হতবুদ্ধির মতো। অ্যালান যখন তার হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে নিলো তখনও নড়লো না। মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর দু'হাত ধরে ওঠালেন তাকে। রান্নাঘরে নিয়ে গেলেন। পেছন পেছন গেলাম আমরা। বুড়ো শয়তানটাকে ফাঁদে ফেলতে পেরে সবাই খুব খুশি। অবশ্য একটু করুণাও যে হচ্ছে না তা নয়। ভীষণ দুর্বল আর আরো বুড়ো দেখাচ্ছে চাচাকে।

মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর নীরবতা ভাঙলেন। 'আরে এত মুষড়ে পড়ার কি আছে, মিস্টার এবেনের? আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, সব কিছু সহজ করে দেবো আপনার জন্যে। এবার দয়া করে তল কুঠুরির (সেলার) চাবিটা দেবেন? আপনার বাবার মদের ভাণ্ডার থেকে একটা বোতল নিয়ে আসুক টোরেন্স। আপনার ভাইপোর সুভবিষ্যৎ কামনা করে পান করবো আমরা।' আমার দিকে ফিরে আমার একটা হাত তুলে নিলেন তিনি। 'ডেভিড, অভিনন্দন জানাচ্ছি তোমাকে। অবশেষে তোমার ভাগ্য ফিরেছে, তোমার পাওনা তুমি পেতে যাচ্ছো।' এরপর অ্যালানের দিকে ফিরলেন তিনি। 'আপনাকেও অভিনন্দন

জানাতে চাই, মিস্টার টমসন। আপনার ভূমিকাটুকু বেশ দক্ষতার সাথেই অভিনয় করেছেন।'

চাচাকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন আইনজীবী। প্রায় এক ঘণ্টা দুজনে আলাপ করলেন সেখানে। এই অবসরে আমি আর অ্যালান মিলে বড় একটা আগুন তৈরি করলাম। আগুনের সামনে বসে আমার আরেকটা পরিকল্পনার কথা জানালাম ওকে। ওর নিরাপত্তার কথা ভেবে তৈরি করেছি এটা।

আমি বললাম, 'শহরের আরেক জন আইনজীবীর সাথে কথা বলেছেন মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর। ভদ্রলোক একজন স্টুয়ার্ট, বাড়ি তোমাদের অ্যাপিন-এ। উনি তোমাকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছেন। উনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তোমাকে ফ্রান্সে পৌঁছে দেয়ার জন্যে একটা জাহাজের ব্যবস্থা করে দেবেন। কাল সকালে আমি যাবো তাঁর কাছে। টাকা পয়সা যা লাগবে দিয়ে আসবো। আশা করা যায় কয়েক দিনের ভেতর তুমি নিরাপদে ফ্রান্সে পৌঁছে যাবে।'

নিঃশব্দে শুনলো অ্যালান। হাঁ বা না কিছু বললো না।

এই সময় মদের বোতল নিয়ে ফিরলো টোরেন্স। তার হাতে যে ভারি ঝুড়িটা ছিলো সেটা টেবিলের ওপর উঠিয়ে ঢাকনা খুলে ফেললো। চমৎকার সুস্বাদু খাবারের গন্ধে ভরে গেল ঘর। খাবারগুলো টেবিলে সাজিয়ে ফেললো টোরেন্স।

একটু পরে মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর যোগ দিলেন আমাদের সাথে। এবেনের চাচা এলো না। এক সাথে আমরা খেলাম, পান করলাম।

খাওয়া দাওয়া শেষে মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর জানালেন, এবেনের চাচা রাজি হয়েছে আমাকে শ বাড়ির আয়ের সিংহ ভাগ দিতে। তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার বলো, তোমার মত কি? তোমার

বুড়ো চাচাকে মরার আগ পর্যন্ত থাকতে দেবে এ বাড়িতে ?'

রাজি তো আগেই হয়েছি। আরেকবার সম্মতি দিলাম শুধু। কেরানী টোরেন্সকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করতে লাগিয়ে দিলেন আইন-জীবী। যথা সময়ে সেগুলোয় স্বাক্ষর করলাম আমি আর চাচা।

অবশেষে লোকগাথার সেই ভিক্ষুক ছেলেটা নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছে। আমি আমার সম্পত্তি ফিরে পেয়েছি। আমি এখন রীতি-মতো ধনী। আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে।

রাতটা আমরা শ বাড়িতেই কাটালাম। রান্না ঘরের বড় বাক্সগুলো আমাদের বিছানা হলো। অ্যালান, টোরেন্স আর মিস্টার র‍্যাঙ্কেইলর নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছেন। কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই। ভবিষ্যৎ পরি-কল্পনা গুছিয়ে নিচ্ছি মনে মনে।

—: শেষ :—

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনো কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন। আজই মানিঅর্ডার যোগে ৫০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান, নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। ইচ্ছে করলে শুধু মাসুদ রানা বা শুধু অনুবাদের গ্রাহক হতে পারেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্য সেলস ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের নাম ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন।

আগামী বই

কেবল মাত্র বড়দের জন্যে

আরব্য রজনীর মনোরম কাহিনী

আলিফ লায়লা-৫

ভাষান্তর : রকিব হাসান

বিষয় : বাদশাহ শারিয়ারকে বলা বেগম শাহরাজাদের এক হাজার এক রাতের সেই বিশ্বনন্দিত অবিস্মরণীয় কাহিনী সম্ভার।

কিশোর ক্লাসিক

কিডন্যাপড

মূলঃ রবার্ট লুই স্টিভেনসন
রূপান্তরঃ নিয়াজ মোরশেদ

সাহায্যের আশায় ধনী চাচার বাড়িতে যাচ্ছে অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে ডেভিড ব্যালফোর।
কিন্তু এ কি?
চাচা এবেনেরের নাম শুনে চমকে উঠছে কেন পথচারীরা? কেন সবাই শ বাড়ি থেকে থেকে শত হাত দূরে থাকতে বলছে ওকে?
কি রহস্য লুকিয়ে আছে ও বাড়িতে?
আপন চাচার ষড়যন্ত্রে বন্দী হল ডেভিড। দাস হিসেবে বিক্রি করার জন্য ওকে জাহাজে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমেরিকায়। তারপর?
ডেভিড কি মুক্তি পাবে ক্যাপ্টেন হোসিসনের জাহাজ কভেন্যান্ট থেকে? কি করে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০